লাল মুকুট

কৃষণ চন্দর

মুক্তধারা

মুক্তধারা ৬৬৪

প্রকাশক ঃ

চিত্তরঞ্জন সাহা

মুক্তধারা

[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]

৭৪ ফরাশগঞ্জ

ঢাকা-১

বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ১৯৬১

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা ঃ শওকতুজ্জামান

মুদ্রাকর ঃ

প্রভাংশুরঞ্জন সাহা

ঢাকা প্রেস

৭৪ ফরাশগঞ্জ

ঢাকা-১

বাংলাদেশ

ডাক্তার শাহজাহান জাবেদ

সংঘাতময় এই শতকের জীবন চলার পথে
যতোই আসুক দুঃখ বেদনা
ভেঙে পড়ো না কখনো কেঁদো না
দৃঢ় মনোবলে রাখিও স্মরণ 'সেবা যে শ্রেষ্ঠ ব্রত'।

এক

অনেক দিন আগের কথা। দুরজ নদীর তীরে মধুপুর নামে একটি গ্রাম ছিল। সে গ্রামে একটি ছেলে থাকত, নাম ছিল তার মুন্না। খেলাধূলা করা ছিল তার সারাদিনের কাজ। তার বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। সে ছিল পিতামাতার একমাত্র আদরের সন্তান। সারাদিন সে ভেড়া ছাগলের পাল নিয়ে নদীর তীরে ঘুরে বেড়াত, বাঁশী বাজাত আর পুতুলের সাথে খেলা করত।

মুন্নার বাবার নাম ছিল ঠাকুর সিং। ঠাকুর সিং ছিলেন একজন কৃষক। খুবই সরল সাদাসিধে। তবে দিনরাত পরিশ্রম করতেন। নদীর তীরে একটা ক্ষেতে ধান চাষ করা হত, গ্রামের সব জমির চেয়ে ঠাকুর সিং এর জমিতে অধিক ফসল উৎপন্ন হত। কারণ ঠাকুর সিং ছিলেন খুবই পরিশ্রমী এবং তিনি খুবই যত্নের সাথে নিজের ক্ষেতে কাজ করতেন। সারাদিন কাজ করে শেষ বিকেলে বাসায় ফিরতেন এবং স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে একত্রে আহার করতেন। স্ত্রী ও ছেলেকে ঠাকুর সিং তার শস্যক্ষেতের মতই ভালবাসতেন।

মুন্নার ঘরের কাছেই ছিল তার মাসীর ঘর। মুন্নার মাসী ছিল খুবই বাক্‌পটু আর ঝগড়াটে মহিলা। তার স্বামী শামুও ছিল একই স্বভাবের। এ ছাড়া সে জুয়া খেলত, মদ খেত এবং নানারকম খারাপ কাজে লিপ্ত থাকত। মাঠে কাজ করত খুবই কম, ফলে তার ধান ক্ষেতে সব সময় ফসল কম হত এবং তার কাপড়-জামাও ছেঁড়া থাকত। শামু গ্রামের মহাজনদের কাছে সব সময়ে ঋণী থাকত। মুন্নার মাসী ও তার স্বামী শামু প্রায়ই মুন্নার মা-বাবার নিকট থেকে সারাদিনের খাবার চেয়ে নিত, মুন্নার মা প্রায় সময়েই বোনের সাহায্য করত। কিন্তু এত কিছু করা সত্ত্বেও মুন্নার মাসী এতটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে কথায় কথায় তার মায়ের সাথে ঝগড়া করত। শামুর অভিযোগ ছিল যে, ঠাকুর সিং-এর ক্ষেতে

অধিক ফসল উৎপন্ন হয় কেন? তার ধারণা ছিল যে, ঠাকুর সিং-এর জমি তার জমির চাইতে উঁচু, এজন্য শামু সব সময়ে লোভাতুর চোখে ঠাকুর সিং-এর জমির দিকে তাকিয়ে থাকত।

একদিনের কথা। ভেড়া-ছাগল চরিয়ে মুন্না ঘরে ফিরছিল। পথে পিতা ঠাকুর সিং-এর সাথে তার দেখা হল। উভয়ের ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছিল। ক্ষুধার চোটে মুন্নার অবস্থা কাহিল হয়ে এসেছিল। সে হাঁটতে পারছিল না। পুত্রকে কাঁধে তুলে নিয়ে ঠাকুর সিং গৃহপানে

এগিয়ে চললেন। পথে তিনি পুত্রকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এক্ষুণি ঘরে যাব, ডালভাত খাব তারপর দুধ খেয়ে শুয়ে ঘুমোব।

এক সময়ে বাড়ী পেঁৗছে পিতাপুত্র ঘরে প্রবেশ করল। মুন্না ঘরে প্রবেশ করেই উচ্চৈঃস্বরে বলল, মা, মা, খেতে দাও, ভীষণ ভুখ্ লেগেছে। কিন্তু তার মা ঘরে ছিলনা, চুলোয় আগুন জ্বলেনি, খাবার রান্না হয়নি। আঙ্গিনায় রক্তাক্ত অবস্থায় একটা ছেঁড়া পুরনো চাদর পড়ে আছে। রক্তাক্ত চাদর দেখে পিতাপুত্র কাঁদতে লাগল, তারা এদিক ওদিক ছুটে গিয়ে প্রতিবেশীদের জিজ্ঞেস করল কিন্তু কেউ মুন্নার মায়ের খবর বলতে পারল না।

খবর জানাজানি হবার পর সারা গ্রামের মানুষ জড় হল। অনুসন্ধান চালানো হল, জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেল যে মুন্নার মা তার ও তার বাবার জন্য খাবার নিয়ে দুপুরে মাঠে যাওয়ার পর আর ফিরে আসেনি। ঠাকুর সিং বললেন, খাবার খেয়ে তিনি মুন্নার মাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মুন্নার মাসী জানায় যে দুপুরে খাবার নিয়ে ক্ষেতে যাবার পর মুন্নার মা আর ঘরে ফিরে আসেনি। এই বলেই সে জোরে জোরে কান্না জুড়ে দিল। কপালে করাঘাত করতে করতে বলল, হায়, এই জালিম ঠাকুর সিং আমার বোনকে খুন করেছে। হায় আমি মরে গেলাম, আমার আদরের বোনকে এই জালিম মেরে ফেলেছে। ওকে ধরো, পুলিশে দাও, ও আমার বোনের হত্যাকারী।

ঠাকুর সিং সবাইকে বুঝিয়ে বললেন, তিনি কিছুই জানেন না, নিজের নির্দোষ হওয়ার কথা নানাভাবে ব্যক্তও করলেন, কিন্তু কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করল না। কারণ দুপুরের পর কেউ মুন্নার মাকে দেখেনি, দুপুরে সে স্বামী ও সন্তানের জন্য খাবার নিয়ে মাঠে গেছে, তারপর আর ফেরেনি। গ্রামের পঞ্চায়েত বলল, ঠাকুর সিংকে আটক রেখে পরদিন পুলিশে দেয়া হোক।

মধুপুর গ্রামে পুলিশ ফাঁড়ি ছিল না। কারণ মধুপুর ছিল একটা ছোট পাহাড়ী গ্রাম। গ্রাম থেকে বিশ মাইল দূরে আদমপুরে ছিল পুলিশ ফাঁড়ি। এ কারণে সঙ্গে সঙ্গে একজন কৃষককে আদমপুরের সেই পুলিশ ফাঁড়িতে পাঠানো হল। রাতের বেলায় সিদ্ধান্ত হল যে, ঠাকুর সিংকে গ্রামের পুরনো শিবালয়ে আটক করে রাখা হবে।

শিবালয় ছিল বহু দিনের পুরনো। কথিত আছে যে, রাজা ভউজ এটি তৈরি করিয়েছিলেন। পাথরের উঁচু টিলার উপর এ

শিবালয় অবস্থিত। শিবালয়ের দরজা ছিল খুবই মজবুত, গ্রামে কাউকে আটক করার দরকার হলে তাকে এই শিবালয়ে বন্দী করে রাখা হত।

শিবালয়ে দু'জন পুরোহিত ছিল, গঙ্গারাম ও যমুনারাম। উভয়ে ছিল সহোদর ভাই, একজন দিনের বেলায় পুজো করত, অন্যজন রাতের বেলায় শিবালয় পাহারা দিত।

ঠাকুর সিংকে শিবালয়ে আটক করার সময়ে মুন্না তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলল, বাবা আমি তোমার সাথে থাকব। বাবা, এ বিরাট পৃথিবীতে আমি একাকী কোথায় থাকব? তুমি আমাকে ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ?

মুন্নার কান্না দেখে অনেকেরই চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। ঠাকুর সিংও কান্না চেপে রাখতে পারলেন না। মুন্নাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি আদর জানালেন। তার অশ্রু মুছে দিয়ে তাকে বললেন, বেটা আমি নির্দোষ, ভগবান জানেন, আমি কোন পাপ করিনি। খুব শীগগির আমি তোমার কাছে ফিরে আসব।

কিন্তু মুন্না কিছুতেই তার বাবাকে ছাড়ে না। বাবার গলা জড়িয়ে ধরে সে অঝোরে কাঁদতে লাগল। বহু কষ্টে গ্রামবাসী পিতাপুত্রকে পৃথক করে মুন্নাকে তার মাসীর কাছে দিয়ে দিল।

রাতে মুন্না খাবার খেলো না। কাঁদতে কাঁদতে মাটিতেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। মুন্নার মাসী ও তার স্বামী আরাম করে তক্তপোষে ঘুমোল।

রাতে মুন্না একটা স্বপ্ন দেখল। দেখে তার মা একটা বড় কামরায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ছটফট করছে এবং কেঁদে কেঁদে মুন্নাকে বলছে:

মুন্না তুমি ছুটে এসে বাঁচাও আমার প্রাণ
কালো কালো ভোমর অনেক আছে এখানে
লাল মুকুটের রাজা আছে
উল্টো হাতের বাজনা আছে
মুন্না তুমি ছুটে এসে বাঁচাও আমার প্রাণ।

স্বপ্ন দেখে মুন্না চিৎকার দিয়ে বলল, মা, মা আমি আসছি। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং মাকে কাছে না পেয়ে সে কাঁদতে শুরু করল। তার কান্নায় মাসীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে মুন্নার গালে একটা চড় দিয়ে বলল, কি মা মা করছিস, শুয়ে ঘুমো, তোর মা মরে গেছে।

না মরেনি বেঁচে আছে, এই মাত্র আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম। মুন্না বলল।

শামু উঠে এসে মুন্নার অন্য গালে আরেকটা চড় দিয়ে বলল, স্বপ্ন কখনো সত্যি হয় না, অবোধ বালক শুয়ে ঘুমো। তোর মা এ জগতে নেই।

দুহাতে মুখ ঢেকে মুন্না দীর্ঘ সময় ধরে কাঁদল এবং কাঁদতে কাঁদতেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে পুলিশ মুন্নার বাবাকে গ্রেফতার করতে এসে শুনলো রাতে দরজা খুলে ঠাকুর সিং পালিয়ে গেছেন। সারা গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গেল। এটা কি করে হল? এটা কি করে হল? পুলিশ এবং অন্য লোকরা পুরোহিতদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল।

---গঙ্গারাম ঠাকুর সিং রাতে কোথায় ছিল?

---জী শিবালয়ে বন্দী ছিল।

---তুমি কোথায় ছিলে?

---আমিও সে কামরায় বন্দী ছিলাম।

---তোমার ভাই যমুনা ছিল কোথায়?

---বাইরে পাহারা দিচ্ছিল।

---তাহলে ঠাকুর সিং বন্ধ শিবালয় থেকে পালাল কি করে?

---আমি কি করে বলব, হুজুর। দরজা বন্ধ ছিল। ভেতরের দেয়াল পাথরের তৈরি, বাইরে বেরোবার মত অন্য কোন দরজা নেই।

---যমুনারাম! রাতে পাহারা দেয়ার সময়ে তুমি কোন লোককে শিবালয়ের বাইরে যেতে দেখেছ?

---জী না, হুজুর।

---তাহলে ঠাকুর সিং কি করে পালাল?

এ সম্পর্কে কারো কিছু জানা ছিল না। তবে ঠাকুর সিং-এর পলায়নে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে সে-ই মুন্নার মাকে হত্যা করেছে, না হলে পালাবে কেন? ঠাকুর সিং-এর পলায়নের পর মুন্নার মাসী-কথায় সবাই বিশ্বাস স্থাপন করল, কিন্তু মুন্না এটা কিছুতেই বিশ্বাস করল না। সে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, আমার বাবা নির্দোষ, তিনি মাকে খুন করেননি।

কিন্তু একটা বালকের কথা কেউ বিশ্বাস করল না। পুলিশের লোকেরা ঠাকুর সিংকে গ্রেফতার করে হাজির করার জন্যে একশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এই পুরস্কারের লোভে লোকজন চারদিকে ছুটে গেল। মুন্নাকে তার মাসী ও শামুর নিকট দিয়ে দেয়া হল।

রাতে যথারীতি মুন্না মাটিতে এবং তার মাসী স্বামী সহ তক্তপোষের উপর শয়ন করল। কিন্তু আজ তার ঘুম পাচ্ছিলনা। কারণ তার মাসী তাকে আজ খেতেও দেয়নি, সে ছিল খুবই ক্ষুধার্ত, তবু মাসী ও তার স্বামীর ভয়ে চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে রইল।

অর্ধেক রাত কেটে যাবার পর শামু পাশ ফিরে মুন্নার মাসীকে জিজ্ঞেস করল, ঘুমিয়েছ? মুন্নার মাসী বলল, না ঘুমুইনি।

শামু বলল, মুন্না ঘুমিয়েছে?

মুন্না তখন চোখ মেলে নানা কথা ভাবছিল। শামুর কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

মুন্নার মাসী তার স্বামীকে জানাল যে, হাঁ মুন্না ঘুমিয়েছে।

শামু বলল, কাল আমি মুন্নাকে কোন একটা বাহানা দিয়ে নদীতে নিয়ে যাব এবং জলে ডুবিয়ে মারব।

---বুদ্ধি তো ভালই।

---তখন ঠাকুর সিং-এর সব জমি আমাদের হাতে এসে যাবে।

---হাঁ তাই।

---তার জমি খুবই ভাল। সে জমি আমাদের হাতে এলে আমরা দুবেলা পেট ভরে খেতে পারব।

---আমি তোমার নিকট থেকে রূপোর চুড়ি আদায় করব।

---হাঁ, তাই করো।

---তাহলে সকালে ঘুম থেকে উঠেই তুমি মুন্নাকে নদীতে নিয়ে যাও। কিন্তু খবরদার, কেউ যেন টের না পায়।

---তুমি নিশ্চিন্ত থাক। এমন সতর্কভাবে কাজ করব যে কেউ বুঝতেই পারবে না।

কিছুক্ষণ পর তারা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়ল এবং তাদের নাসিকা গর্জন শুরু হল। কিন্তু মুন্নার ঘুম পাচ্ছিল না। ভয়ে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা দেহ কাঁপছিল। কারণ সে জেনে ফেলেছে সকালে তার সাথে কি আচরণ করা হবে।

তারপর মুন্না বিছানা ছেড়ে উঠল এবং সাহস করে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরের বারান্দায় দুটি ষাঁড় বাঁধা, বারান্দার চারদিকে উঁচু দেয়াল। এক পাশ দিয়ে দরজা রয়েছে, সে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তবে তাতেও তালা লাগানো, এখন মুন্না বাইরে যাবে কি করে?

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর মুন্নার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে ষাড় দু'টির নিকট গিয়ে তাদের আদর জানাতে লাগল। ষাঁড় দু'টি তাকে জানত, এজন্য জিহ্বা বের করে আদর জানাতে শুরু করল। পরমুহূর্তে মুন্না লাফ দিয়ে একটা ষাঁড়ের পিঠের উপর উঠে বসল। ষাড়ের পিঠ থেকে লাফ দিয়ে দেয়ালের পাশের ঢালু ছাদে গিয়ে পৌঁছাল। কোথায় যেন একটা কুকুর জোরে ঘেউ ঘেউ করছে। মুন্না ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ওপাশে লাফিয়ে পড়ল। দেয়াল ছিল খুব উঁচু এজন্য নীচে পড়ে সে হাঁটুতে ব্যথা পেল। তবে এখান থেকে সহজে সে আত্মরক্ষা করতে পারবে, এজন্য ব্যথা পেয়েও মুন্না উঁহু শব্দ পর্যন্ত করল না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিজের ঘরে চলে গেল। কুকুরটি তখনো ঘেউ ঘেউ করছিল। এটা হল মুন্নার কুকুর ডুব্বু। মুন্না কাছে গিয়ে বলল চুপ করো ডুব্বু।

ডুব্বু মুন্নাকে চিনতে পেরে নীরব হয়ে লেজ নাড়তে লাগল। ডুব্বু ছিল খুবই সাহসী কুকুর। তার দেহ ছিল অন্যান্য কুকুরের চেয়ে উঁচু। সে প্রভুভক্ত পাহাড়ী কুকুর। তার দুটি কান লম্বা লম্বা, সারা গায়ের লোম কালো, চোখ দু'টি উজ্জ্বল চমকানো। তার কণ্ঠস্বর বেশ শ্রুতিমধুর।

কুকুরের আওয়াজে মুন্নার মাসী ও তার স্বামীর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। তারা যখন দেখল যে মুন্না ঘুমিয়ে নেই তখন সব বুঝতে পারল। শামু তখন ছোরা হাতে নিয়ে মুন্নাকে মারতে ছুটে গেল।

মুন্না কুকুরের কাছে দাঁড়িয়েছিল। দূরে থেকে যখন দেখল যে শামু তার দিকে আসছে তখন মুন্না ডুব্বুর পিঠে আরোহণ করে বলল, ডুব্বু, তোমার মুন্নার জীবনাশংকা দেখা দিয়েছে, জমির লোভে আমার মাসী ও তার স্বামী আমাকে মেরে ফেলতে চায়। চল তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালিয়ে যাই।

কুকুর তখন মুন্নার কথা বুঝে ফেলেছিল। মুন্নাকে পিঠে করে সে দ্রুত ছুটতে লাগল। শামু তাদের অনুসরণ করছিল। যেতে

যেতে কুকুরটি মুন্নাকে নিয়ে নদীর তীরে পৌঁছল। পেছনে শামু আসছিল। সামনে একটা নদী, নদীর ওপারে কালো পাহাড়। পাহাড়ের জঙ্গল খুবই ঘন, সেখানে বাঘ, চিতাবাঘ প্রভৃতি বাস করে। পাহাড়ের চূড়ায় সব সময়ে বরফ পড়ে। মুন্না এখন কোন্‌দিকে যাবে ? পিছন দিক থেকে শামু আসছে, সামনে নদী। হঠাৎ মুন্না ডুব্বুকে বলল, এদিকে শামুর মার, ওদিকে পুলিশের তাড়না, আমাকে নিয়ে ডুব্বু কালো পাহাড়ে চল।

একথা শোনামাত্র ডুব্বু নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুন্না শক্ত করে ডুব্বুর পঠে বসে আছে। ডুব্বু নদীর ওপারের দিকে যাচ্ছিল। শামু তখন ছোরা হাতে নদী তীরে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে জানতো যে সাঁতার দিয়ে সে ডুব্বুর সাথে পারবে না। কিছুক্ষণের মধ্যে ডুব্বু মুন্নাকে নিয়ে নদীর ওপারে পৌঁছে গেল। মুন্না তখন ডুব্বুর পিঠ থেকে নামল। তারপর তারা জঙ্গলের দিকে ছুটে গেল।

দুই

সেদিন রাতে মুন্না ও ডুব্বু একটা গুহার মধ্যে লুকিয়ে কাটাল। রাতে জঙ্গল থেকে ভয়াবহ শব্দ ভেসে আসছিল। বাঘের গর্জন, ভালুকের আওয়াজ, সাপের চিৎকার। দূরে কোথাও অন্য কোন জন্তুও চিৎকার করে ওঠে। গুহার সামনে মুন্না যখন মাঝে মাঝে লাল বাতির মত চোখ দেখতে পায়, তখন তার কুকুর ডুব্বু জোরে জোরে চিৎকার দিয়ে ওঠে। ডুব্বুর সারা গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। ডুব্বুর ঘেউ ঘেউ শব্দে লাল লাল চোখ আপনা থেকেই হারিয়ে যায়।

মুন্না ও ডুব্বু কোনক্রমে সে রাত গুহার মধ্যে কাটাল। সূর্যোদয়ের পর তারা গুহা থেকে বেরোল। এখন তারা যাবে তো কোথায় যাবে? ঘরে ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। সামনে ঘন জঙ্গল। তাছাড়া শামু তাদের খুঁজতে আসে কিনা এ ভয়ও ছিল। এজন্য মুন্না জঙ্গলে অবস্থান করাই ভাল মনে করল।

রাতের বেলায় জঙ্গলকে খুবই ভয়াবহ মনে হতো। কিন্তু সকাল বেলায় ভাল লাগতো। সবুজ সতেজ পাতায় পাতায় শিশিরের মুক্তা ছড়িয়ে আছে, সে শিশিরে গাছের ছালও ভিজে আছে, মনে হয় যেন গাছগুলো এ মাত্র অবগাহন করে এল। গাছের শাখায় রং-বেরং-এর তোতা বুলবুল প্রভৃতি পাখী আনন্দ প্রকাশ করছে। দূরে বাঁশঝাড়ের নীচে একদল হাতী আপন মনে ঘাস খাচ্ছে। এক পাল হরিণ টানা টানা চোখ তুলে তাকিয়ে এক মনে ছুটে যাচ্ছে। মোট কথা, সকাল বেলায় জঙ্গলের দৃশ্য মুন্নার খুবই ভাল লাগল। এতদিন জঙ্গলকে সে ভয় করতো। অথচ তারতো শামুর মত বদমাশ মানুষদের ভয় করা উচিত।

জঙ্গলের মাঝ দিয়ে একটা নদী প্রবাহিত হচ্ছিল। এটা দুরজ নদী। যা কিনা তাদের গ্রামের উপর দিয়ে প্রবাহিত। কিন্তু এখানে সে নদীর পানি কি নির্মল ও স্বচ্ছ। পানির নীচে ছোট ছোট লাল পাথর মুক্তোর মতো চমকাচ্ছে।

মুন্না দীর্ঘ সময় ধরে সে নদীতে স্নান করল এবং সুন্দর সুন্দর পাথর একত্র করল। এ খেলা ভাল না লাগলে সে নদী থেকে

উঠে এলো। ডুব্বু তাঁকে দেখে আস্তে আস্তে শব্দ করছিল এবং দু' একটা করে ঘাস খাচ্ছিল। মুন্না কুকুরের দিকে তাকিয়ে বলল, ডুব্বু মনে হয় আমার মতো তোমারও ক্ষুধা পেয়েছে। কিন্তু এখন খাবার পাওয়া যাবে কোথায়?

হিফ্ হিফ্। ডুব্বু জোরে জোরে চিৎকার করে উঠল। অর্থাৎ খাবার কোথায় পাবে সে আমি কি জানি। কিন্তু আমার খাবার চাই-ই। মুন্না বলল, আচ্ছা দেখা যাক কোথাও থেকে কিছু পাওয়া যায় কিনা। চল নদীর ধারে চল।

নদীর ধারের জঙ্গলে খাবার পাওয়া গেলনা। অনেক দূরে এগিয়ে যাওয়ার পর মুন্না একটা আঙ্গুর গাছ দেখতে পেলো। সবুজ সতেজ পাতার আড়ালে লাল আঙ্গুর ঝুলছে। মুন্নার মুখে পানি এসে গেল। সে চিৎকার করে ডুব্বুকে বলল, ডুব্বু খাবার পাওয়া গেছে। এই বলে মুন্না আঙ্গুরের দিকে অগ্রসর হল। হঠাৎ কি একটা শব্দ শুনে মুন্না চমকে উঠল। কিছুটা পিছনে সরে গিয়ে সে দেখল আঙুর গাছের শাখায় একটা সাপ বড় একটা বানরকে জড়িয়ে রেখেছে। সাপটি বানরকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে।

বানরের দুরবস্থা দেখে মুন্না বিচলিত হয়ে উঠল। সে মাটির কাছাকাছি ঝুলে থাকা সাপের লেজে বড় বড় ঢিল ছুঁড়ে মারল। কিন্তু তাতে সাপের কোন ক্ষতি হল বলে মনে হল না। ডুব্বু তখন জোরে জোরে ঘেউ ঘেউ করছিল। সে একবার সামনে এগুচ্ছিল একবার পিছনে সরে যাচ্ছিল। মুন্না ডুব্বুকে বলল, ভয় পেলে চলবে না, বানরের প্রাণ বাঁচাতে হবে।

ডুব্বু যেন তার মনিবের কথা বুঝে ফেলেছিল। সে সাহসিকতার সাথে সামনে এগিয়ে সাপের ঝুলন্ত লেজে বারবার দংশন করল। কুকুরের প্রবল দংশনে এক সময়ে বানরের উপর সাপের বন্ধন শিথিল হয়ে এল এবং সাপ বানরকে ছেড়ে দিল। বানর ধপ করে নীচে এসে পড়ল, সাপটি দ্রুত একদিকে পালিয়ে গেল। ডুব্বু তখনো ঘেউ ঘেউ করছিল। মুন্না বলল, যেতে দাও ডুব্বু, এসো বানরকে দেখি।

বানর তখন আধমরা অবস্থায় মাটিতে পড়েছিল। মুন্না ও ডুব্বু একটু দেরী করে গেলে বানর মারা যেতো। বানরটি খুব ভাল জাতের। বেশ বড়সড়। গায়ের রং পাকা টমেটোর মতো। মুন্না বানরটিকে উঠিয়ে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল এবং নানাভাবে

আদর করল। নদীর তীরে নিয়ে তাকে পানি খাওয়ালো। দীর্ঘ সময় পর বানরের সংজ্ঞা ফিরে এলে মুন্নাকে মাথায় হাত বুলাতে দেখে সে খুব খুশি হলো। খুশি হবে না কেন? মুন্নাইতো তার জীবন রক্ষা করেছে। বানর দাঁত বের করে আনন্দে চিৎকার করল চিহিঁ চিহিঁ।

কুকুর শব্দ করলো হিফ্ হিফ্।

মুন্না বানরটির নাম রাখলো চিহিঁ চিহিঁ। বানরকে সে বলল, ভাই চিহিঁ চিহিঁ, আমার ডুব্বুর ভারি ক্ষুধা পেয়েছে, তুমি কিছু একটা ব্যবস্থা কর।

বানর মুন্নার দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নাচতে নাচতে সামনের দিকে চলে গেল। মাঝে মাঝে সে পেছনে ফিরে তাকাচ্ছিল। মুন্না এবং ডুব্বুও বানরটাকে অনুসরণ করল। কিছু-ক্ষণের মধ্যে তারা একটা বড় আখরোট গাছের নীচে এসে পৌঁছল। চিহিঁ চিহিঁ গাছে উঠে শাখা থেকে আখরোট ছিঁড়ে নীচে ফেলছিল। সবুজ রংএর শক্ত আখরোট হাতে নিয়ে মুন্না ভাবল, এ আবার কি রকম ফল। গ্রামে সে শুকনো আখরোট খেয়েছিল বটে তবে এরকম সবুজ আখরোট দেখেনি। আখরোটে কামড় দিয়ে তার মনে হল খুবই কটু, এজন্য রাগ করে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

চিহিঁ চিহিঁ বানর মুন্নার কাণ্ড দেখে শব্দ করে হাসল। যেন তাকে বলছে, দেখ মুন্না, তুমি কত নির্বোধ, তুমি আখরোট পর্যন্ত

খেতে জান না। তারপর বানর হুঁ হুঁ করে মুন্নার সামনে পাথর টুকরা দিয়ে একটা একটা আখরোট ভেঙ্গে তার ভেতর থেকে সাদা নরম শাঁস বের করে খেতে শুরু করল। মুন্না তখন আখরোটের মজা বুঝতে পারল, সেও বানরের মত আখরোট ভেঙ্গে খেতে শুরু করল। বানর তার দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে যেন বলছিল, খাও, এখানে তো রুটি নেই তবে আখরোটের শাঁস রয়েছে। এ শাঁস কতো ভাল কতো মিষ্টি। তারপর তিন বন্ধু মিলে পেট পুরে আখরোট খেল। মুন্না তখন নদীর দিকে যেতে যেতে বলল, আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। চিহিঁ চিহিঁ মুন্নাকে নদীতে যাওয়া থেকে বিরত রাখল। সে মুখে এক প্রকার শব্দ করে মাথা নাড়াল। মুন্না বিস্মিত হয়ে বানরের দিকে তাকিয়ে রইল। বানর তখন জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। মুন্না ভাবল বনের বানর তাদের ছেড়ে বনে ফিরে গেছে। সে ডুব্বুর দিকে ব্যথিত চোখে তাকিয়ে বলল, চল ডুব্বু সামনে চল, বনের পশু বনে চলে গেছে, কিন্তু তুমি আমার পরীক্ষিত বন্ধু, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না তাইনা? ডুব্বু খুশিতে লেজ নাড়তে লাগল এবং মুন্নার হাত চাটতে লাগল।

এমন সময় মুন্না দেখল চিহিঁ চিহিঁ সহ তিনটি বানর তিনটি ছাগলকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। ছাগল তিনটির স্তন দুধে স্ফীত; ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে তারা মুন্নার দিকেই ছুটে আসছে।

মুন্না গ্রামের ছেলে, সারাদিন ছাগল ভেড়া চরাত, তাদের দুধ দোহন করত। কখন কখন বাঁটে মুখ লাগিয়ে দুধ খেত। এখন তাই করল, পেট পুরে সে ছাগলের দুধ পান করল। তারপর হাসিমুখে বানরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলল, বাহ্ বাহ্ চিহিঁ চিহিঁ ভাল করেছ। এখন খুব ভাল লাগছে।

ডুব্বু মিয়াঁও রিয়াঁও বলে ক্রোধ প্রকাশ করল। অর্থাৎ কি ভাই আমি দুধ পাব না?

মুন্না বলল, এ্যাই ডুব্বু তোর দুধ খাওয়া হয়নি তাই রেগেছিস? ইস কি ভুল হয়ে গেল। কিন্তু কি করা, তোর জন্য পাত্র কোথায় পাব? তারপর মুন্না বানরের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি ছাগল-গুলোকে সামনে রাখ, আমি জঙ্গল থেকে একটা পাত্র কুড়িয়ে আনি।

মুন্না পাত্র কুড়াতে যাচ্ছিল এমন সময় ডুব্বু কান খাড়া করলো এবং ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। ছাগল তিনটি কান খাড়া করে

এদিক ওদিক তাকিয়ে এক দৌড়ে পালিয়ে গেল। বানর তিনটি চিৎকার করে আখরোট গাছে চড়ে বসল। মুন্না বুঝে ফেলল যে, জঙ্গলে বিপদাশংকা দেখা দিয়েছে। এজন্য সেও বানরদের সাথে আখরোটের ঘন পাতাবিশিষ্ট একটা ডালায় উঠে আত্মগোপন করল। কুকুরটি একদিকে পালিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ যাবত বনে থমথমে নীরবতা বিরাজ করল। তারপর মুন্না দেখল সাত আটজন ডাকাতের একটা দল এদিকেই আসছে। তাদের মুখের অর্ধাংশ কাপড় দিয়ে ঢাকা, পিঠে ভারি বোঝা, হাতে বন্দুক। তাদের সামনে একটা ছোট মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে হাঁটছে আর বলছে, আমি মায়ের কাছে যাবো, মা কোথায়? 'ওমা মাগো!'

কিন্তু ডাকাতরা মেয়েটির কান্নাকাটির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা টিলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তিন

ডাকাতদের দল জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর মুন্না ধীরে ধীরে গাছ থেকে নীচে নেমে গাছের সাথে হেলান দিয়ে ভাবতে লাগল: লোকগুলো কে, কোথা থেকে এলো, মেয়েটিই বা কাঁদছিল কেন? বহু সময় চিন্তা-ভাবনা করার পরও নিজের প্রশ্নের জবাব না পেয়ে সে এদিক ওদিক তাকালো। চিহিঁ চিহিঁ তখন নীচের দিকে হাত ও মাথা ঝুলিয়ে আখরোট গাছের সাথে জড়িয়ে আছে। এক হাত সে মুন্নার হাতে দিয়ে রেখেছে অন্য হাত ডুব্বু লেহন করছে। মুন্না উভয় বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল, যেভাবেই হোক ডাকাতদের হাত থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করতে হবে। বানরটি যেন মুন্নার কথা বুঝে ফেলেছে এমন ভাব করে না না উচ্চারণ করে এক লাফে গাছের উচ্চ শাখায় আরোহণ করল। ডুব্বুকেও খুব একটা খুশী মনে হল না, এজন্য মুন্না তাকে বলল, তোমরা মনে হয় ডাকাত দেখে ভয় পেয়েছ, এজন্য আমার সাথে থাকতে চাওনা। যদি তাই হয় তবে তোমরা এখানে থাক, আমি একাই ডাকাতদের অনুসরণ করব। এই বলে কিছুদূর যেতেই ডুব্বু তাদের পিছনে ছুটে গেল, বানরটি এটা

লক্ষ্য করে সেও বন্ধুদের সাথে মিলিত হল। টিলার কাছে গিয়ে চিহিঁ চিহিঁ ঘাস শুঁকে আন্দাজ করল ডাকাতরা কোথায় গেছে। ঘাস শুঁকে বানর যেদিকে যাচ্ছিল মুন্না ও ডুব্বুও সেদিকে যাচ্ছিল। দীর্ঘক্ষণ তারা এভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হলো। ক্রমেই বন ঘন হয়ে আসছিল। গভীর বনের পর একস্থানে বিস্তৃত খোলা মাঠের মত জায়গা, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় তিনশ গজ। সেখানে কোন গাছপালা নেই। চারদিকে লম্বা লম্বা ঘাস, মাঝখানে একটা পুরনো দোতালা বাড়ী।

জঙ্গলের মধ্যে এ পাকা বাড়ী এলো কিভাবে? মুন্না বিস্মিত হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল। বাড়ীটি বহুদিনের পুরনো। দেওয়াল মাঝে মাঝে ধসে পড়েছে। কোন কোন দেয়ালের ফাঁকে আগাছা জন্ম নিয়েছে। জানালায় পাখীরা বাসা বেঁধেছে। দুএকটি কামরা প্রায় অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

বাড়ীটির কাছাকাছি গিয়ে বানরটি উঁহু উঁহু শব্দ করে ভয়ে একটি গাছের শাখায় উঠে চড়ে বসল। মুন্নার ইশারা পেয়ে ডুব্বুও তার সাথে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে গেল।

মুন্না বানরকে বলল প্রাচীনকালের কোন রাজার বাড়ী বলে মনে হচ্ছে। বানর ঘাড় নাড়িয়ে উঁহু উঁহু শব্দ করল এবং দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

মুন্না তখন জিজ্ঞেস করল, তবে কি কোন ভূতুড়ে বাড়ী? একথা শুনে বানর এক লাফে গাছ থেকে নেমে মুন্নার কাছে গিয়ে বসল। মুন্না বানরকে বলল, সামনে এগিয়ে যাও, দেখ এ ভাঙ্গা বাড়ীর মধ্যে কি রয়েছে?

বানর মাথা নেড়ে বলল না, না।

মুন্না তখন বানরটিকে বলল, তবে তুমি এখানে দাঁড়াও আমি গিয়ে দেখে আসি। এই বলে মুন্না কোন শব্দ না করে হামাগুড়ি দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হল। বানরের আচরণ দেখে সে বুঝে গিয়েছিল যে, সশস্ত্র ডাকাতদল এখানেই লুকিয়ে আছে। সে একটা সাত বছরের বালক, তার কাছেতো একটা চাকুও নেই।

কিন্তু মুন্না এতটুকু ভয় পেলোনা, সে মনে মনে বলল, বয়স কম তাতে কি, বুকে সাহস রাখতে হবে। সামনে এগিয়ে যাও। এই বলে দৃঢ় পদক্ষেপে মুন্না বাড়ীর কাছে গিয়ে বেল গাছের আড়ালে

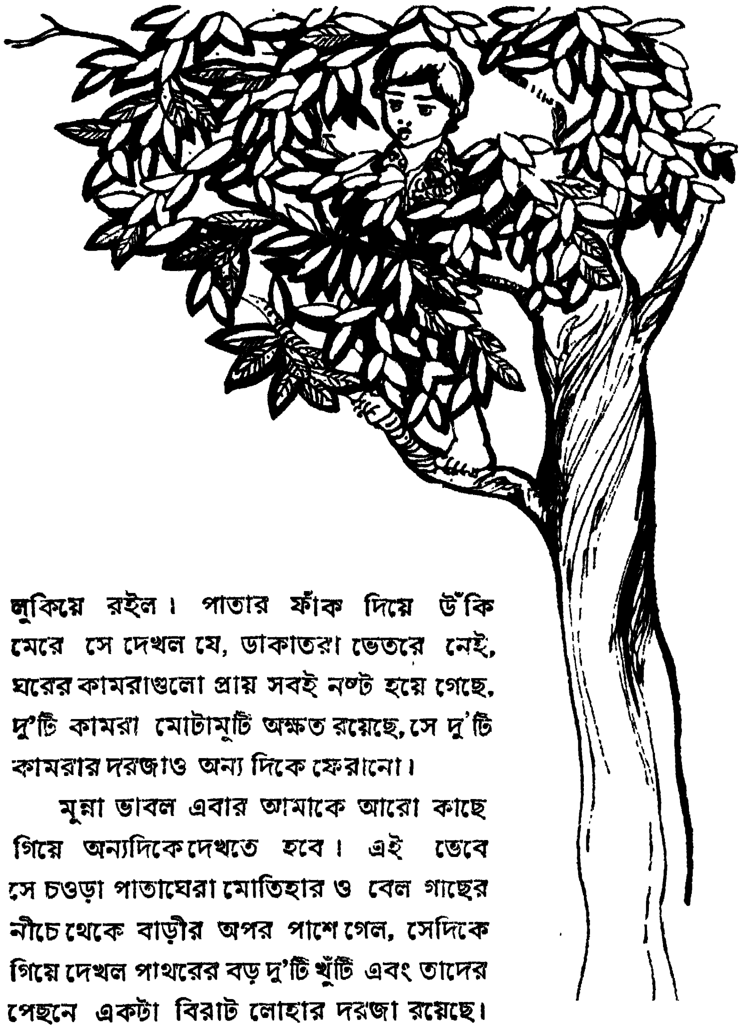

লুকিয়ে রইল। পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে সে দেখল যে, ডাকাতরা ভেতরে নেই, ঘরের কামরাগুলো প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গেছে, দু'টি কামরা মোটামুটি অক্ষত রয়েছে, সে দু'টি কামরার দরজাও অন্য দিকে ফেরানো।

মুন্না ভাবল এবার আমাকে আরো কাছে গিয়ে অন্যদিকে দেখতে হবে। এই ভেবে সে চওড়া পাতাঘেরা মোতিহার ও বেল গাছের নীচে থেকে বাড়ীর অপর পাশে গেল, সেদিকে গিয়ে দেখল পাথরের বড় দু'টি খুঁটি এবং তাদের পেছনে একটা বিরাট লোহার দরজা রয়েছে। দরজা তখন খোলা ছিল এবং ভেতরে একটা বিরাট হলঘর দেখা যাচ্ছিল। হলঘরে ডাকাতরা নিজেদের গাঁটরির মত বোঝা মাথার নীচে চাপা দিয়ে শুয়ে আলাপ করছে। মুন্না একটা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের আলাপ শুনছিল।

একজন ডাকাত বলল, এখন কি করতে হবে?

অন্যজন জবাব দিল এখন আমাদের রামশাহ্ শাহুকারের কাছে খবর পাঠানো উচিত যে, তার মেয়ে আমাদের কাছে রয়েছে। যদি সে তার মেয়ে কনুলার প্রাণ রক্ষা করতে চায় তাহলে তাকে আমাদের পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে। তারপর আমরা তার মেয়েকে ফিরিয়ে দেব। আর যদি সে পুলিশে খবর দেয় তবে আমরা তাকে খুন করব।

এতটুকু শোনার পর মুন্না আরো ভালভাবে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে গেল।

তৃতীয় ডাকাত চতুর্থ জনকে বলল, পঞ্চাশ হাজার টাকা পরিশোধ করলে আমরা রামশাহ্ শাহুকে তার মেয়ে ফিরিয়ে দেব তাই না? জবাবে চতুর্থ ডাকাত ধমক দিয়ে বলল, আরে নির্বোধ, রামশাহ্ শাহুকার পঞ্চাশ হাজার টাকা পরিশোধ করতে আসলে আমরা তাকেও গ্রেফতার করব এবং তার আত্মীয়স্বজনের নিকট শাহুকারের জীবনের নিরাপত্তার কথা জানিয়ে এক লক্ষ টাকা দাবি করব।

লোকটাকে দলনেতা বলে মনে হল। তার কথা শুনে একজন ডাকাত বলল, খুব ভাল কথা বলেছ সরদার! সরদার বলল, আজ রাতেই নীল পাহাড়ে অবস্থানরত আমাদের লোকদের জানিয়ে দিতে হবে তারা যেন আজই রামশাহ্ শাহুকারের বাড়ীতে খবর পাঠিয়ে দেয়।

সরদার যে পাহাড়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছিল মুন্না তাকিয়ে দেখল সেটি কালাপাহাড়ের চেয়েও উঁচু। দূরে থেকে তার রং নীল মনে হচ্ছে। সে পাহাড়-চূড়া কালো মেঘে ঢাকা। এতো দূরের পাহাড়ে আজ রাতের মধ্যে একটা লোক কি করে গিয়ে পৌঁছাবে এটা মুন্না কিছুতেই বুঝতে পারল না। তবে সে এটা বুঝতে পারল যে, কালা পাহাড়ে নিশ্চয়ই এমন লোক থাকে যাদের কারণে একজন পিতা ও তার মেয়ের জীবনাশংকা রয়েছে।

কিছুক্ষণ পর ডাকাত-সর্দার একজন ডাকাতকে জিজ্ঞেস করল যে কনুলা নামের সেই মেয়েটি কোথায়?

জবাবে ডাকাত বলল, সর্দার, তাকে আমি খাবার খাইয়ে উপরের কামরায় তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছি।

সর্দার বলল, খুব ভাল করেছ। তোমরা সবাই এখন বিশ্রাম কর গিয়ে। গত দু'রাত ঘুমুতে পারনি, আজ রাতেও জেগেই কাটাতে হবে।

কিছুক্ষণ পর মুন্না উঁকি দিয়ে দেখল সব ডাকাত ঘুমিয়ে পড়েছে। সে তখন কিছুটা পিছনে খোলা মাঠে গিয়ে কনুলা যেখানে বন্দী রয়েছে দোতালার সেই কামরার দিকে তাকিয়ে রইল। মুন্না তখন ভাবল কি করে মেয়েটির কাছে পেঁছান যায়। যদি সে ভেতরের কামরার মধ্য দিয়ে উপরে উঠে তবে ডাকাতদের ঘুম ভেঙে যেতে পারে। ঘুম ভাঙলে ডাকাতরা ওকেও গ্রেফতার করে রাখবে। উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। সে দেখল তুঙ্গ গাছের একটা শাখা দোতালার জানালার কাছাকাছি পেঁছে গেছে। এ বুদ্ধি মাথায় আসার পর মুন্না ধীরে ধীরে তুঙ্গ গাছে আরোহণ করে দোতালা সোজাসুজি গিয়ে ভেতরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখল। কনুলা তখন একটা বিছানায় ঘুমিয়ে ছিল। কনুলা যে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে তার গালে অশ্রু শুকিয়ে যাওয়া দাগ দেখে মুন্না সেটা বুঝতে পারল।

মুন্না ভালভাবে তাকিয়ে দেখল কামরায় কনুলা ছাড়া আর কেউ নেই। ডাকাতরা তো নীচের তলায় ঘুমিয়ে আছে। মুন্না তখন গাছের শাখা থেকে এক পাশে জানালায় গিয়ে পেঁছাল, শব্দ হতেই কনুলা জেগে গেল এবং চিৎকার দিতে চাইতেই মুন্না মুখে হাত দিয়ে নীরব থাকার ইঙ্গিত করল। তারপর কাছে গিয়ে বলল, ভয় পেয়ো না, আমি তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।

চার

কনুলা বিস্ময়ভরে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে?

—আমি মুন্না।

—তুমি আমাকে ডাকাতদের কবল থেকে কিভাবে উদ্ধার করবে, তুমি তো আমার মতোই খুব ছোট। ওরা তোমাকে দেখা মাত্রই মেরে ফেলবে। ওরা খুনী ডাকাত।

—তুমি চিন্তা করো না। তুমি আমার হাতে তোমার হাত দিয়ে দাও, আমি তোমাকে জানালার বাইরে নিয়ে যাচ্ছি।

কনুলা জানালার কাছে গিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলল, না ভাই, আমি এই জানালার নীচে লাফিয়ে পড়তে পারব না। নীচে পড়ার সাথে সাথে আমি মরে যাব।

—জানালার নীচে লাফিয়ে পড়ার দরকার নেই, এ গাছের শাখা ধরে আমার পিছনে পিছনে এস।

—যদি এ শাখা ভেঙ্গে যায় ?

—ভাঙ্গবে না।

—আমি তো কখনো গাছে চড়িনি, না না আমি আসব না।

মুন্না রেগে বলল, তবে এখানে ডাকাতদের কাছে থাক, আমি ফিরে যাচ্ছি। এই বলে মুন্না জানালার দিকে চলে গেল। তাকে যেতে দেখে কনুলা দৌড়ে গিয়ে মুন্নার হাত ধরে কাঁপা গলায় বলল, আমাকে ছেড়ে যেও না।

—তাহলে আমার কথা শুনতে হবে।

কনুলা কম্পিতভাবে মুন্নার হাত ধরে তার সাথে পিটার গাছের শাখায় এসে নীচে নামতে লাগল। তাদের ভারে পিটারের একটি শাখা ভাঙ্গতে চাইলে মুন্না আর একটি শাখায় গিয়ে উঠল। অবশেষে বহু কষ্টে তারা নীচে নামল এবং ভুতুড়ে বাড়ী থেকে গভীর জঙ্গলের ভেতরের দিকে ছুটে চললো। যেতে যেতে একস্থানে পৌঁছে কনুলা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আর হাঁটতে পারছিনা।

মুন্না বলল, কিন্তু আমরা তো এখানে থামতে পারি না, ডাকাতরা ধরে ফেলবে।

কনুলা বলল, আমি পায়ে হেঁটে যেতে পারব না, আমাকে বিগ্‌গি এনে দাও।

বিগ্‌গি কি ? মুন্না বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করল।

কনুলা হাসতে হাসতে বললো, হায়, তুমি বিগ্‌গি চেনো না, বিগ্‌গি একরকম গাড়ী, তার সামনে দুটো ঘোড়া থাকে। আমার বাবার কাছে একটা সুন্দর বিগ্‌গি গাড়ী রয়েছে। আমি প্রতিদিন সে গাড়ীতে ভ্রমণ করি। বলতে বলতে কনুলা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

মুন্না রেগে বলল, এখানে তো দুই ঘোড়ার বিগ্‌গি নেই, দুই পায়ের বিগ্‌গিতেই চলতে হবে।

কনুলা মুখ কালো করে বলল, আমি যাব না, কিছুতেই যাব না।

মুন্না বেপরোয়াভাবে বলল, তবে এখানেই থাকো। এই বলে সে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

মুন্না কিছু দূর চলে যেতেই কনুলা জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করল। মুন্না ছুটে এসে কনুলার হাত ধরে সামনের দিকে নিয়ে

যেতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুন্নার অনুগত কুকুর ডুব্বু হিফ্ হিফ্ করতে করতে তার কাছে ছুটে এল। মুন্না কনুলার কাছে ডুব্বুর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, ও আমার ডুব্বু।

কনুলা গর্বের সাথে বলল, আমাদের বাড়ীতে এর চেয়েও ভাল কুকুর রয়েছে, সে কুকুর বিলেত থেকে আনা হয়েছে।

—কি করে সে ?

—কিছুই করে না, সারাদিনই আমার কোলের উপর থাকে।

—ছিঃ সেও কি কোন কুকুর। আমার ডুব্বু খুবই তাগড়া, জোয়ান, আমার সব কাজ করে দেয়। তারপর মুন্না ডুব্বুকে আওয়াজ দিয়ে বলল, ভাইয়া, এই বেকুব মেয়েটাকে তোমার পিঠে তুলে নাও তো !

কনুলা ভয়ে পিছিয়ে গেল। বলল, এ তো খুব জোরে আওয়াজ দেয়।

—কিন্তু তোমাকে কামড়াবেনা, তুমি ওর পিঠে উঠে বস।

কনুলা ভয়ে ভয়ে ডুব্বুর পিঠের উপর বসল। ডুব্বু তখন কনুলাকে নিয়ে দ্রুত ছুটে চলল।

কনুলা খুশী হয়ে বলল, আরে, এতো দেখছি বিগ্‌গির চেয়েও ভাল সওয়ারী, এসো মুন্না, তুমিও ডুব্বুর পিঠের উপর এসে বস।

মুন্না বলল, না কনুলা, ডুব্বু এতো বোঝা বহন করতে পারবে না।

তাদের কিছুদূর যাওয়ার পর উল্লিখিত বানর একটা গাছ থেকে লাফিয়ে মুন্নার কাঁধের উপর পড়ল। কনুলা ভয় পেয়ে চিৎকার করে বলল, ওমা, বানর বানর !

মুন্না বানরের গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, ও হলো গিয়ে মিয়া চিহিঁ চিহিঁ। এই জঙ্গলেই থাকে, আমি ওকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছি।

আমার তেষ্টা পেয়েছে। কনুলা ঠোঁটের উপর জিভ চেটে বলল।

মুন্না বানরকে জিজ্ঞেস করল, এখন এখানে পানি কোথায় পাওয়া যাবে ?

বানর চিৎকার করে বলল চিখাচুঁ চিখাচুঁ।

এতটুকু বলে বানর মুন্নার ঘাড় থেকে লাফিয়ে পড়ল এবং জঙ্গলের একদিকে দ্রুত ছুটে গেল। ডুব্বু তখন কনুলাকে নিয়ে বানরের পিছনে পিছনে ছুটল। মুন্নাও তাদের অনুসরণ করল।

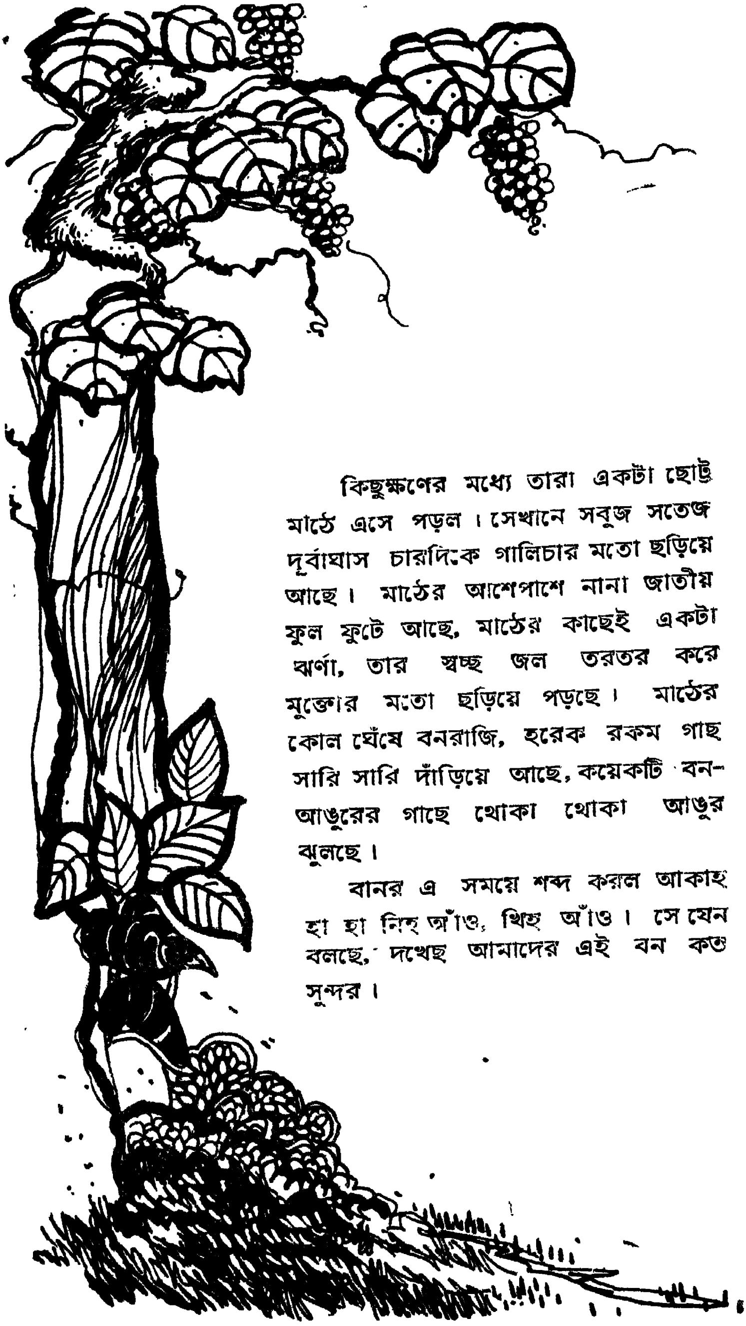

কিছুক্ষণের মধ্যে তারা একটা ছোট্ট মাঠে এসে পড়ল। সেখানে সবুজ সতেজ দূর্বাঘাস চারদিকে গালিচার মতো ছড়িয়ে আছে। মাঠের আশেপাশে নানা জাতীয় ফুল ফুটে আছে, মাঠের কাছেই একটা ঝর্ণা, তার স্বচ্ছ জল তরতর করে মুক্তোর মতো ছড়িয়ে পড়ছে। মাঠের কোল ঘেঁষে বনরাজি, হরেক রকম গাছ সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে, কয়েকটি বন-আঙুরের গাছে থোকা থোকা আঙুর ঝুলছে।

বানর এ সময়ে শব্দ করল আকাহ্ হা হা নিহ্ আঁও, খিহ্ আঁও। সে যেন বলছে, দেখছ আমাদের এই বন কত সুন্দর।

প্রথমে কনুলা ও মুন্না ঘাসের উপর শুয়ে জল পান করল। তারপর কনুলা গুর্চ ও সিমবলু নামের বন্য ফল সংগ্রহ করে খেল। ততক্ষণে বানর গাছের মগডালে উঠে বসল এবং থোকা থোকা আঙুর নীচে ফেলতে লাগল। ছয় সাত থোকা আঙুর কিছুক্ষণের মধ্যে নীচে ফেলে বানর গাছের মগডাল থেকে নেমে এল। সে এত পাতলা ডালে গিয়েছিল, মুন্না বা কনুলা কারো পক্ষেই সেখানে যাওয়া সম্ভব হত না। তারপর সবাই মিলে পেট ভরে আঙুর খেল।

খাওয়ার পর মুন্না বলল, এবার এখান থেকে যাওয়া দরকার

কনুলা বলল, আমার তো ঘুম পাচ্ছে।

মুন্না বলল, তবে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে নাও।

মুন্নাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কতইবা আর ওদের বয়স। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘাসের কোলে মাথা রেখে মুন্না ও কনুলা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ডুব্বু তখন তাদের পায়ের কাছে মাথা রেখে বসে আছে। তার চোখ তন্দ্রায় ঢুলু ঢুলু। বানর তখন একটা গাছের শাখায় উঠে আনন্দ করছে। ও ঘুমায়নি, কারণ ওদের ঘুম খুবই কম।

মুন্না ও কনুলা এভাবে কতোক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল বলতে পারবে না। হঠাৎ কনুলার মনে হল কে যেন তীব্রভাবে তার নাক মুখ শুঁকছে। কনুলা ভয়ে চোখ মেলল, দেখল একটা বিরাট ভালুক তার মুখের উপর ঝুঁকে আছে। কনুলা চিৎকার করে উঠল। মুন্নারও ঘুম ভেঙে গেল। সে দেখল তুঙ্গ-এর শাখায় বসে বানর চিৎকার করছে, একটা গাছের আড়ালে থেকে ডুব্বুও ঘেউ ঘেউ করছে। ভালুক দুপায়ের উপর দাঁড়িয়ে খাঁউ খাঁউ শব্দ করল।

কনুলা সভয়ে বলল, নাঁ না আঁ আমাকে খেয়ো না।

খাঁ আঁউ খাঁউ—ভালুক জোরে শব্দ করল।

মুন্না এক বুদ্ধি করল। সে ছুটে গিয়ে চোখের আড়াল থেকে গুর্চ-এর ফল এনে ভালুকের সামনে ফেলল। কনুলা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল, কারণ ভালুক এক হাতে তাকে জড়িয়ে রেখেছে, অন্য হাতে গুর্চ খাচ্ছে। গুর্চ ফল ভালুকের খুবই প্রিয়।

এ সময়ে বানর আঙুরের থোকা এনে ভালুকের সামনে রাখল। পর পর কয়েকটি থোকা পেড়ে এনে এনে সে ভালুককে দিচ্ছিল আর ভালুক মজা করে খাচ্ছিল। খেতে খেতে পেট ভরে যাওয়ার পর ভালুক কনুলার হাত ছেড়ে দিল। কনুলা ভয়ে মাটির উপর শুয়ে পড়ল। ভালুক তখন দুই পায়ের উপর দাঁড়িয়ে প্রবলভাবে নাচতে লাগল। তার দেখাদেখি বানর এবং কুকুরও নাচ জুড়ে দিল। এ দৃশ্য দেখে মুন্না এবং কনুলাও নাচতে শুরু করল। নাচের সাথে তারা হাত তালিও দিচ্ছিল। ওরা সবাই এখন একে অন্যের বন্ধু হয়ে গেছে।

নাচতে নাচতে ভালুক ক্লান্ত হয়ে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। তার তামাশা দেখে কনুলা খুব করে হাসল। ততক্ষণে তার ভয় একদম কেটে গেছে। সে ভালুকের মুখের লম্বা লম্বা গোঁফে আঙুল চালিয়ে তাকে আদর জানাতে লাগল। এক সময়ে বলল, আসলেই তুমি খুব ভাল, কি নাম তোমার?

ভালুক তখন ধীরে অথচ গম্ভীর ভাবে শব্দ করল : গুররম গুররম।

কনুলা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, ও, তোমার নাম গুররম ? মুন্না শুনছ, আমাদের ভালুকের নাম গুররম।

কিছুক্ষণ পর ভালুক আবার মুন্না ও কনুলাকে সামনে দু'পায়ে আঁকড়ে তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল।

মুন্না অনুনয় করে বলল, গুররম, আমাদের যেতে দাও, ডাকাতরা ধাওয়া করলে আমাদের মেরে ফেলবে।

খাঁ আঁউ, খাঁউ। ভালুক জোরে চিৎকার করলো এবং মুন্নাও কনুলাকে সামনে করে নিয়ে যেতে লাগল। পালানোর পথ নেই দেখে মুন্না, কনুলা, বানর ও কুকুর ভালুকের আগে আগে চলল। যেতে যেতে তারা ঢালু একটা এলাকায় পেঁছাল। সেখানে বন নেই, গাছ পালা নেই, উচু নীচু টিলা রয়েছে। মাঝে মাঝে ছোট-বড় গুহা, একটা গুহার কাছে গিয়ে মুন্না ও কনুলা দেখল ভেতরে কাউ গাছের পাতা দেখা যাচ্ছে। সেটাই ছিল ভালুকের ঘর। ভালুক তাদের চারজনকে গুহার ভেতর বন্দী করে রেখে গুহামুখে একটা বিরাট পাথর চাপা দিয়ে খাঁউ খাঁউ শব্দ করে চলে গেল।

মুন্না বলল, ভালুক এবার তার বৌকে ডেকে আনতে গেছে, তার পর দুজন মিলে আমাদের খেয়ে ফেলবে।

ডুব্বু ভয়ে চিৎকার করল ইঁয়াউ ইঁয়াউ।

বানর বলল, তিখ্ তিখ্ তাউ, উঁ উঁ। ভাই। এখন আমরা কি করব ?

কিছুক্ষণ চিন্তার পর মুন্নার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে বলল, এস কনুলা, আমরা সবাই পাথরটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ফেলে এখান থেকে পালিয়ে যাই।

তার পর তারা চারজন মিলে পাথরকে জোরে জোরে ধাক্কা দিল, কিন্তু একটুও নাড়াতে পারল না। বানর এক পাশে বসে মাথা চুলকাতে লাগল। কনুলা এক পাশে বসে ফোঁপাতে লাগল। মুন্না অনেক চেষ্টার পর ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে বলল, কোথায় এসে আটকালাম ?

কনুলা ক্রোধভরে বলল, তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ, ডাকাতদের কাছে থাকলে ওরা প্রাণে তো আর মারত না।

মুন্নাও ক্রুদ্ধ হল। সে জবাব দিল, এখন তোমার ডাকাতদের কাছে চলে যাও।

দীর্ঘক্ষণ পর তারা দেখল কে যেন পাথর সরাচ্ছে। কনুলা চিৎকার করে বলল, বাঁচাও বাঁচাও, আমরা এই গুহার ভেতর বন্দী হয়ে আছি।

পাথর গুহামুখ থেকে সরে গেল। মুন্না চিৎকার করে বলল আল্লার ওয়াস্তে আমাদের বাঁচাও, একটা ভালুক আমাদের এখানে বন্দী করে রেখেছে, আমাদের বাঁচাও।

পাথর সরে যাওয়ার পর ওরা দেখল গুহামুখে ভালুক দাঁড়িয়ে আছে, ওর হাতে একটা মৌচাক। অতিথিদের সামনে মৌচাক রেখে ভালুক গর্জন করে উঠলো ঃ খাঁউ, খাঁউ।

মুন্নার ভয় কেটে গেল। সে বুঝতে পারল গুররম আসলে তাদের খেতে চায় না। তারা তো ওর অতিথি। সে গুররম কোথা থেকে একটা মৌচাক এনেছে ওদের আতিথেয়তার উদ্দেশ্যে। ভালুকটি মৌচাকটি ভেঙ্গে সবাইকে খেতে দিল।

কনুলা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, এ মধুতো খুবই ভাল।

মুন্না বলল, বনের আসল মধু।

বানর মধু খেতে খেতে বলল, চিখাচিখ, চিখাচিখ।

বানর এর আগে এরকম সম্মান কোথাও পায়নি, বনের ভালুক ওকে মধু খাওয়াচ্ছে একি যা তা ব্যাপার! সে নিজেও মৌচাক থেকে মধু খেতে পারে না কারণ মৌমাছিরা গায়ে পিঠে হুল ফুটিয়ে লাল করে দেয়। ভালুকের গায়ে মুখে ঘন লোম। মৌমাছিরা তাকে কামড়াতে পারে না।

ডুব্বু মধু খেয়ে আনন্দে ঠোঁট চাটতে চাটতে বলল, হা হিফ হা হিফ।

সবাই তৃপ্তির সাথে মধু খাওয়ার পর ভালুক অতিথিদের গুহার বাইরে নিয়ে গিয়ে আলাদা আলাদাভাবে সবাইকে ধাক্কা দিল। তারপর নিজে লাফ দিয়ে দূরে সরে বনের মধ্যে চলে গেল। বেশ কিছু দূরে গিয়ে ভালুক পিছন ফিরে হাত তুলে বিদায় জানাল। মুন্নাও জবাবে হাত তুলে ভালুককে নমস্কার করল। তারপর স্বগত-ভাবে বলল, ভালুক ভাই, তুমি আমাদের খাঁটি বন্ধু প্রমাণিত হলে। ভালুককে বিদায় জানিয়ে পাশ ফিরে কনুলার হাত ধরে বলল, দেখলে, ভালুক আমাদের জীবিতাবস্থায় ছেড়ে দিয়েছে, এস আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।

কনুলা বলল, কোথায় ?

মুন্না বলল, তোমাদের বাড়ী।

কনুলা বলল, আমাদের বাড়ীত এখান থেকে অনেক দূরে ঐ উঁচু নীল পাহাড়ের কাছে। ওদিকে যাওয়ার পথ তো আমার জানা নেই।

মুন্না তাকে সাহস দিয়ে বলল, অসুবিধা নেই, আমরা পথ খুঁজে নেব। তবে আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

কনুলা বলল, এতো তাড়াতাড়ি কিসের। আমি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আগামীকাল সকালে রওয়ানা করব।

—না, আমাদের এখন বিশ্রামের সময় নেই।

—কেন ?

—কারণ ডাকাতরা এতক্ষণে তোমার পালিয়ে যাওয়ার খবর জেনে ফেলেছে, ওরা এখন আমাদের খোঁজ করছে।

—কিন্তু ওরা এখানে আসবে কি করে ? আমরা তো বহু দূরে চলে এসেছি।।

—তা ঠিক, কিন্তু আরো একটা ভয় আছে।

—সেটা কি ?

—নীল পাহাড়ে পৌঁছে তোমার বাবাকে বাঁচাতে হবে।

—সে কি রকম ?

—আমি ডাকাতদের আলোচনা শুনেছি। ওরা এখন তোমার বাবাকে ধরে এনে তার কাছ থেকে টাকা আদায় করবে।

—তবে চল, এক্ষুণি চল। আমি এক মিনিটও আরাম করব না। এই রাতের মধ্যেই গিয়ে বাবাকে সাবধান করে দেব।

মুন্না ডুব্বুকে ইঙ্গিত করে বলল, চল ডুব্বু। তারপর আবার চারজন যাত্রা করল। ছোট ছোট পাহাড়ের পর খোলা প্রান্তর, প্রান্তরের ওদিকে নীল পাহাড়, ওদের সেখানে যেতে হবে। নীল পাহাড় আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ে চূড়ায় সাদা সাদা বরফকে টুপির মত মনে হচ্ছে। পাহাড়ের এক পাশে একটা উঁচু দুর্গের মত কি যেন দেখা যাচ্ছে।

কনুলা সেদিকে ইঙ্গিত করে বলল, ওখানেই আমাদের ঘর, ওখানেই আমার বাবা থাকেন। আমাদের ওখানেই যেতে হবে।

মুন্না বলল, চল চল বন্ধুরা আমরা নীল পাহাড়ে যাব।

পাঁচ

চার বন্ধু সারা রাত ধরে চলল। প্রথমে তারা কালাপাহাড়ের ঘাঁটি অতিক্রম করল, তারপর নদী পার হয়ে নীল পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হ'ল। কনুলা খুব ক্লান্ত হয়ে গেলে ডুব্বু তাকে তার কাঁধে তুলে নিত। নীল পাহাড়ের পথ ছিল কালো পাহাড়ের চেয়েও দুর্গম, বন্ধুর ও সংকীর্ণ। এত সংকীর্ণ যে একটুখানি ভুল হলে বা পা পিছলে গেলে তারা গভীর তলদেশে নিমজ্জিত হত। কিন্তু চিহিঁ চিহিঁ সফরের ব্যাপারে খুবই চতুরতার পরিচয় দিল। সে দেখে শুনে পথ অতিক্রম করছিল। প্রথমে তাদের সামনে পড়ল বিরাট কাঁঠাল বন। গাছের ডালে ডালে ভারী ভারী কাঁঠাল ধরে আছে। কাঁঠাল বন শেষে চালতা ও দেবদারুর বন। এ বন অতিক্রমের সময়ে রাত শেষ হয়ে এসেছে। সারা বনপথ কুয়াশায় ভিজে গেছে। আকাশে ছিটেফোটা মেঘ জেগে আছে। কিছুক্ষণ পরই সূর্যোদয় হল। বনের ছায়ায় সূর্যের সোনালী কিরণ ছড়িয়ে পড়লো, মনে হচ্ছিল যেন সোনালী গালিচা পেতে দেয়া হয়েছে। এ বন মুন্নার খুবই ভাল লাগল।

পথ চলার ক্লান্তিতে তাদের পা ভারী হয়ে এসেছিল। অবশেষে তারা একটা সুন্দর ঝর্ণার নিকটে এসে থেমে পড়ল।

কনুলা বলল, এখান থেকে আমাদের ঘর এক মাইল দূরে।

তুমি বুঝলে কি করে? মুন্না জিজ্ঞেস করল।

কনুলা জবাবে বলল, এখানে থেকে আমাদের বাড়ীতে পানি নেয়া হয়।

—তাহলে মনে কর যে তোমাদের বাড়ী এসে পড়েছে।

—হাঁ, কিন্তু আমি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, কিছুক্ষণ এখানে বিশ্রাম করব।

শীতল পানি পান করে একটু খানি বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়ায় কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা ঘুমিয়ে পড়ল। এভাবে কত সময় তারা ঘুমিয়ে ছিল কেউ বলতে পারবে না। এর মধ্যে ডুব্বু ও চিহিঁ চিহিঁ

কয়েকবার শব্দ করে ওদের জাগাতে চেষ্টা করেছে কিন্তু কারও ঘুম ভাঙ্গে নি। এক সময়ে বানর ওদের হাত ধরে নাড়া দিয়ে ঘুম ভাঙ্গাল। ঘুম ভাঙ্গতেই কনুলা দেখল তার বাবা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তার চোখ অশ্রুসজল। কনুলা চিৎকার করে বাবা বলে তাকে জড়িয়ে ধরল। তার বাবা আনন্দাশ্রু মুছে তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন।

কনুলা তার বাবার সাথে মুন্নার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, বাবা, ও হলো মুন্না, ও-ই আমাকে ডাকাতদের কবল থেকে উদ্ধার করেছে।

কনুলার বাবা মুন্নার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

এক সময়ে পিছনে ফিরে কনুলা দেখল কয়েকজন লোক বাবার পিছনে বন্দুক হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কয়েকজনকে চিনে ফেলে কনুলা বলল, বাবা, এই ডাকাতরাই তো আমাকে বন্দী করেছিল।

কনুলার বাবা মাথা নীচু করে বলল, হাঁ মা আমি জানি। এখন ওরা আমাকে ধোকা দিয়ে ধরে নিয়ে এসেছে।

বন্দীশালায় কনুলাকে না দেখে ডাকাতরা ভয় পেয়ে গেল। তারা ভাবল যে, যদি তারা শীঘ্রই কনুলার বাবাকে আটক না করে তাহলে তারাই উল্টো বিপদে পড়বে। এজন্য কনুলার খোঁজ না করে তারা কনুলার বাবাকে ধরে আনার সিদ্ধান্ত করল। অন্য একটা ডাকাত দল নীল পাহাড় এলাকার কাছে থাকত, কনুলার বাবাকে ধরে আনার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সেখানে পেঁৗছার পর পূর্বোক্ত ডাকাতরা দেখল যে, কনুলার বাবা পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে তার মেয়েকে উদ্ধার করতে প্রস্তুতি নিয়েছে। প্রথমোক্ত ডাকাতরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে নিয়ে এল। তারপর কনুলারকে যেখানে বন্দী করে রেখেছিল সেই পুরনো বাড়ীর উদ্দেশ্যে নিয়ে চলল। তারা কনুলার বাবাকে বলে দিয়েছিল যে, এক লাখ টাকা না দেয়া হলে তাকে মুক্তি দেয়া হবে না।

কনুলাকে পুনরায় ফিরে পাওয়ার পর ডাকাতরা তার বাবার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবী করল। তারা বলল, এখনতো আমরা তোমার মেয়েকে আবার পেয়ে গেছি, কাজেই আমাদেরকে এক লাখ টাকা দিতেই হবে। তা না হলে আমরা উভয়কে প্রাণে মেরে ফেলব। আর টাকা পাই

বা না পাই এ ছেলেকে আমরা অবশ্যই গুলী করব, কারণ সেই তো আমাদের কাছ থেকে কনুলাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

এতটুকু বলে একজন ডাকাত মুন্নাকে কানে ধরে খুব করে মারল। মার খেতে খেতে মুন্না সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ

পর সংজ্ঞাহীন মুন্নাকে একজন ডাকাত কাঁধে তুলে নিল, অন্যেরা বন্দুক তাক করে কনুলা ও তার বাবাকে কালো পাহাড় এলাকার দিকে নিয়ে চলল। পাহাড় এলাকার সেই পুরনো বাড়ী দীর্ঘদিন থেকে ডাকাতদের প্রধান কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

মুন্নার সংজ্ঞা ফিরে এলে সে দেখল একজন ডাকাত তাকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। পিছনের দিকে তাকিয়ে সে দেখল তার অনুগত বন্ধু ডুব্বু পিছনে পিছনে আসছে। চিহিঁ চিহিঁকে কোথাও দেখা গেল না। মুন্না ভাবল বনের বানর ভয়ে পালিয়ে গেছে। ওদের উপর ভরসা করা যায় না। কিন্তু হঠাৎ সে দেখল তার ধারণা ঠিক নয়, চিহিঁ চিহিঁ তাদের অনুসরণ করছে। কিছুক্ষণ পর মুন্না চোখ মেলে হাসতে লাগল।

ডাকাত ধমক দিয়ে বলল হাসছ কেন?

মুন্না বলল, এমনিতেই।

ডাকাত মুন্নাকে পিঠের উপর থেকে নামিয়ে দিয়ে বলল, আমার সামনে সামনে চল।

মুন্না ক্রুদ্ধভাবে বলল, আমি হাঁটতে পারব না।

ডাকাত গর্জন করে বলল, হাঁটো না হলে গুলী করব।

মুন্না ডাকাতদের সামনে হাঁটতে লাগলো এবং গুণ গুণ করে গান ধরল:

মিয়া বান্দর মিয়া বান্দর
মায়া মাছন্দর মায়া মাছন্দর
সামনে পিছে দুই প্রান্তর
মাঝে ভালুক ভাইয়ের ঘর।
ভালুক ভাইয়ের ঘরে যাও
মুন্নার কাহিনী তারে শোনাও।

কি যা তা বলছ? ডাকাত গর্জন করে বলল।

মুন্না বলল, কিছুনা একটা গান গাচ্ছি।

ডাকাত বলল, চুপ কর।

মুন্না সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল কিন্তু আড়চোখে বানরের দিকে তাকাল। বানর ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে।

দুপুর পর্যন্ত ডাকাতরা দেবদারু বন পেরিয়ে কাঁঠাল বনে প্রবেশ করল। গাছে গাছে বড় বড় কাঁঠাল ঝুলে আছে। ডাকাতরা পুলিশী অভিযানের আশংকা করছিল এজন্য দ্রুত অগ্রসর হ'ল। কাঁঠাল বনের মাঝামাঝি এক স্থান দুপুরেও রাতের মত মনে হয়। ডাকাতরা সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষে বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে ডাকাতরা কালা পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'ল।

মুন্নার প্রতি যে ডাকাতটি লক্ষ্য রাখছিল সে সর্দারকে বলল, এ বজ্জাত ছেলেকে সাথে সাথে রাখা কি এমন বুদ্ধিমত্তার কাজ ? ওর কাছ থেকে আমরা কতটা লাভবান হব ? কনুলা ও তার বাবার কাছ থেকে তবু যা হোক এক লাখ টাকা পাওয়ার আশা আছে কিন্তু এ ছেলের বাবাতো এক পয়সাও দেবে না।

সর্দার জিজ্ঞেস করল, তুমি কি করতে চাও ? ডাকাত বলল, আমার মতে ওকে এখানেই গুলী করে হত্যা করে মাটিতে লাস পুঁতে রেখে আমাদের নিজেদের পথে যাওয়াই ভাল।

কনুলা এ সময় কেঁদে কেঁদে তার বাবাকে বলল, মুন্না আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, আপনি ওর প্রাণ বাঁচান।

কনুলার বাবা হাত জোড় করে ডাকাত সর্দারকে বললেন, এ দরিদ্র ছেলেকে মেরে কি লাভ ? ও তোমাদের কি এমন ক্ষতি করেছে ? আমার সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সেজন্য টাকা আদায় করবে কিন্তু এ ছেলেকে মেরে কি লাভ ?

এ আবেদনের জবাবে ডাকাত সর্দার কনুলার বাবার মুখে এত জোরে ঘুষি মারলো যে, মুখ থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। ডাকাত সর্দার বলল, এই বদমাশ ছেলেকে নিয়ে যাও, একটা গাছের সাথে বেঁধে ওকে গুলী করে দাও।

একটা ডাকাত মুন্নাকে নিয়ে কাঁঠাল গাছের সাথে বাঁধতে লাগল। কনুলা কাঁদছিল। মুন্না আবার গান ধরল :

মিয়া বান্দর মিয়া বান্দর
মায়া মাছন্দর মায়া মাছন্দর
গুররম ভাই আসো
মুন্নার প্রাণ বাঁচাও।
সামনে পিছে যায়না যাওয়া
কাঁঠাল গাছের নীচে মৃত্যু খাড়া।
মহাবন্দী, কাঁঠালের ঝড় বইয়ে দাও।

ডাকাত বন্দুক তাক করে মুন্নার প্রতি লক্ষ্য স্থির করল।

ডাকাত সর্দার বলল, এক !

মুন্না জোরে চিৎকার করল, মহাবন্দী কাঁঠালের বৃষ্টি বইয়ে দাও। দাও।

ডাকাত সর্দার বলল, দুই।

তিন বানর আগেই চারদিক থেকে বড় বড় কাঁঠাল এনে ডাকাতদের মাথায় বৃষ্টির মতো বর্ষণ করতে লাগল। বন্দুক উদ্যত ডাকাতের হাত থেকে বন্দুক পড়ে গেল। চারদিকে যেন কাঁঠালের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার হওয়ার কারণে ডাকাতরা বুঝতে পারলনা যে, কোন দিক থেকে হামলা হচ্ছে।

ডাকাত সর্দার চিৎকার করে বলল, পুলিশ এসে পড়েছে। পালাও পালাও।

তারপর ডাকাতরা বন্দুক ও অন্যান্য জিনিসপত্র সেখানে ফেলে দে ছুট। কিছুক্ষণের মধ্যেই এ সব ঘটে গেল। তখন গাছ থেকে দশ বারোটি বানর ও ছয় সাতটি ভালুক কাঁঠাল গাছ থেকে নেমে এলো। ভালুকদের সামনে সেই পূর্বের ভালুক গুররম। ওরা এসে মুন্নাকে ঘিরে ধরলো। চিহিঁ চিহিঁ দাঁত দিয়ে কট কট করে মুন্নার বাঁধন কেটে দিল। কনুলা ছুটে এসে গুররমের ঘন লোমে হাত বুলাতে লাগলো। তার বাবা ভয়ে কাঁপছেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে এসব কি হচ্ছে?

কনুলা তার বাবাকে বলল, ও হলো গিয়ে গুররম ভাই। ওরা আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছে।

তার বাবা ভয়ে ভয়ে বলল, কিন্তু ওরা তো বনের ভালুক, কিন্তু ওরা দেখছি মানুষরূপী শয়তানগুলোর চেয়ে অনেক ভালো।

মুন্না চিহিঁ চিহিঁকে গলায় জড়িয়ে ধরে বলল, তোমরা যদি সে মুহূর্তে জঙ্গল থেকে কাঁঠাল না ছুঁড়তে, তবে আমার বাঁচা সম্ভব হত না।

বানর খুশী ভরে বলল, খাঁআঁউ-খাঁউ।

গুররম মুন্নার হাত ধরে সামনের দিকে ইঙ্গিত করল। মুন্না বুঝে ফেলল। সে কনুলা ও তার বাবাকে বলল, গুররম বলছে, ডাকাতরা চলে গেছে, এখন তাড়াতাড়ি আমাদের কোন নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়া দরকার।

কনুলার বাবা বলল, আমাদের বাড়ী ছাড়া আর কোন্ জায়গা নিরাপদ হতে পারে?

মুন্না বলল, তাহলে চলা যাক। বনের বন্ধুরা আমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

তারপর তারা দলবদ্ধভাবে কনুলাদের গৃহের পথে রওয়ানা হলো। ডুব্বু আনন্দে বারবার লেজ নাড়ছিল। কনুলা গুররম এর পিঠে ও মুন্না অন্য একটা ভালুকের পিঠের উপর চড়ে বসল। ডুব্বু ও কনুলার বাবা পাশাপাশি হাঁটছিল। চিহিঁ চিহিঁ সবার আগে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে চাঁদ উঠলে, চাঁদের আলোয় তাদের পথ খুঁজে পেতে কষ্ট হল না। পথে দুটি বাঘ ও দুটি চিতাবাঘ পর পর সামনে পড়ল কিন্তু তারা এ বিচিত্র কাফেলার দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে চলে গেল।

ধীরে ধীরে রাত হয়ে এল। কাফেলা দেবদারু বনও অতিক্রম করল। সকালের মনোমুগ্ধকর স্নিগ্ধ আলোয় কনুলাদের দুর্গ সদৃশ বাড়ী খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। কনুলা খুশী ভরে বলল, আমাদের ঘর এসে পড়েছে।

তারপর মুন্না ও কনুলা ভারাক্রান্ত মনে ভালুক ও বানরদের বিদায় জানাল এবং কনুলার বাবার হাত ধরে তাদের বাড়ীতে প্রবেশ করল

ছয়

কনুলাদের বাড়ীতে মুন্নার আদর যত্নের কোন ত্রুটি হলো না। কনুলা ও তার বাবা সব সময়ে মুন্নার প্রতি লক্ষ্য রাখত। মুন্নার থাকার জন্য পৃথক একটা কামরার ব্যবস্থা করা হল। কামরার দেয়ালে গোলাবী রঙের প্রলেপ, জানালায় সুন্দর পর্দা, বিছানা নরম তুলতুলে। মুন্না এত নরম বিছানায় শুতে অভ্যস্ত ছিল না এজন্য প্রথম রাতে তার ঘুমই এল না। সে শক্ত তক্তপোষে ও মেঝেতে ঘুমিয়ে অভ্যস্ত ছিল। সকালে চাকরানী তার জন্য গরম দুধ নিয়ে এসে দেখল যে মুন্না মেঝেতে ঘুমিয়ে আছে। চাকরানী তাড়াতাড়ি গিয়ে কনুলাকে ডেকে এনে এ দৃশ্য দেখাল। কনুলা মুন্নাকে জিজ্ঞেস করায় মুন্না বলল, এ কি ধরনের বিছানা? সারারাত আমি ঘুমুতে পারিনি। এ কথা শুনে কনুলা ও চাকরানী খুব করে হাসল।

কনুলাদের বাড়ীতে মুন্নাকে পরিধানের জন্য ভাল ভাল জামা কাপড় দেয়া হল। তার মাথায় চুল কাটা হল ইংলিশ ফ্যাশানে। তার

পায়ে দেয়ার জন্য জুতো মোজা এনে দেয়া হল। এর আগে মুন্না কখনো জুতো পরেনি, এজন্য জুতা পরতে তার একটুও ভাল লাগল না। তার মনে হল কে যেন তার পা আটকে রেখেছে। এর আগে সে কখনো মোজা দেখেইনি। চাকরানী মোজা নিয়ে আসার পর মুন্নার কাছে কনুলাও দাঁড়িয়েছিল। মুন্না মোজা দেখে জিজ্ঞেস করল, এটা কি?

—মোজা।

—মোজা আবার কি?

চাকরানী মোজা দেখিয়ে বলল, মোজা মোজাই এটা এক প্রকার কাপড় দিয়ে পায়ে দেয়ার জন্য তৈরি করা হয়।

মুন্না বলল, কি মোজা মোজা করছ, বল যে, পায়ে দেয়ার কাপড়।

মুন্নার কথা শুনে কনুলা ও চাকরানী হাসলো। মুন্না রেগে গেল এবং জুতা মোজা ফেলে রেখে বাড়ী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। অনেক কষ্টে কনুলা ও তার বাবা তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত করল।

মুন্না প্রথম প্রথম এ নতুন জীবনের সাথে একাত্ম হতে পারেনি। আস্তে আস্তে সব বুঝে নিয়েছে। তারপর সে চেয়ার, টেবিল, সোফা, বাথরুম, ছুরি, কাঁটা, পানাহার, কথা বলার ঢং সব কিছু শিখে ফেলল। প্রতিদিন বিকেলে সে কনুলার সাথে চার ঘোড়ার ফিটনে আরোহণ করে ভ্রমণে বেরোত। তাদের নিরাপত্তার জন্য গাড়ীর সাথে চারজন বন্দুকধারী পাহারাদার দেয়া হত। ডাকাতদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর কনুলার বাবা বাড়ীতে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করেছিলেন। তখনো ডাকাতদের আক্রমণের আশংকা পুরো কেটে যায়নি, এজন্য মুন্না ও কনুলা যেখানেই যেত তাদের সাথে পুলিশ প্রহরা দেয়া হত।

নীল পাহাড়ের চূড়ায় সাদা সাদা বরফ দেখে কয়েকবারই সেখানে উঠে বরফ নিয়ে খেলতে মুন্নার ইচ্ছে হল, সে দূরে চালু এলাকায় সময় কাটিয়েছিল, দূরে থেকে সে বরফ দেখেছে, সেখানে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। মুন্না কনুলার কাছে, কনুলা তার বাবার কাছে এ ইচ্ছের কথা বললে তিনি বললেন, নীল পাহাড়ের চূড়া খুবই ভয়াবহ, সেখানে সব সময়ে বরফ জমে থাকে। ওখানে খুবই ঠাণ্ডা বাতাস বয়। তাছাড়া ওখানে একটা ভূত থাকে বলে শুনেছি, এজন্য ভয়ে কেউ ওদিকে যায় না।

কনুলা বলল, বাবা, আমরা তাহলে ওদিকে যাব না।

মুন্না বলল, আমি অবশ্যই সেখানে যাব এবং সেই ভূতকে দেখে ছাড়ব। ভূত দেখার আমার খুবই ইচ্ছে।

কনুলার বাবা বলল, ভূত কেউ দেখতে পায়না। ভূত এলে জোরে বাতাস বয়, মেঘ গর্জন করে, বিদ্যুৎ চমকায়। ভূত তখন ঝড়ের সাথে গান গাইতে গাইতে আসে। তবে সব ভূতের গানের আওয়াজও শোনা যায় না, এবং সবাই তার গান বুঝতেও পারে না। তবে যে কিনা ভূতের গান বুঝতে পারে এবং তার ছায়া দেখতে পায় মণিমুক্তা দিয়ে ভূত তার ঝোলা ভরে দেয়।

মুন্না জিজ্ঞেস করল, এরকম মণিমুক্তা নিয়ে এ যাবত কেউ ফিরে এসেছে ?

কনুলার বাবা বলল, আমি এখনো দেখিনি তবে শুনেছি। এও শুনেছি. যে একবার ভূতের পাল্লায় পড়েছে সে আর ফিরে আসেনি।

কনুলা কম্পিত কণ্ঠে বলল, তবে বাবা আমরা কখনো পাহাড় চূড়োয় যাব না।

মুন্না বলল, না আমি বরফের সাথে খেলা করতে চাই।

কনুলার বাবা বলল, শীতকালে এখানেও অনেক বরফ পড়বে, তখন যত খুশী খেলা কর।

ভূতের গল্প শুনে পাহাড় চূড়ায় যাওয়ার জন্য মুন্নার মন আরো অধীর হয়ে উঠল। দুদিন যাবত সে ওখানে যাওয়ার জন্য নীরবে প্রস্তুতি নিল। প্রতিদিনের খাবার থেকে কিছু রেখে দিয়ে একটা পাত্রে জমা করল, একটা শক্ত ঝুড়ি হাতে নিল, গমর গরম মোজার উপর

জুতা পরিধান করল। তারপর একদিন সকালে কনুলা ও তার বাবা ঘুমে থাকতেই মুন্না জানালা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে চলে গেল। পাহারাদার পুলিশেদের চোখে ফাঁকি দিয়ে অন্ধকার থাকতেই সে এগিয়ে চলল। ধীরে ধীরে আঁধার কেটে গিয়ে চারদিকে ভোরের রোদ চিক চিক করে উঠল। মুন্নার চলার বিরাম নেই। পাহাড় চূড়ার কাছে এসে সে একটা ছোট্ট ঝর্ণার কাছে থামল। সে ঝর্ণার পানির রং আকাশের মত নীল। চারদিকে বরফের বড় বড় বরফ খণ্ড ঝর্ণাটিকে ঘিরে আছে। ঝর্ণার পানিতে প্রভাতের রোদের ঝিলিমিলি মুন্নার খুবই ভাল লাগল। ঝর্ণার কাছে বসে মুন্না খাবার পাত্র একপাশে রাখল এবং ঝর্ণাতীরের বরফ ভেঙে ভেঙে খেতে লাগল। বরফ ছিল খুবই শক্ত এবং কাঠের টুকরার মত শক্ত, কিন্তু মুখে দেয়ার সাথে সাথে গলে যায়। মুন্না তিনচার টুকরো বরফ খেল। তার খুবই ভাল লাগল। চারদিকে থমথমে নীরবতা ছেয়ে আছে, আশে-পাশে কেউ নেই। তার মনে হল সে যেন পৃথিবীর ছাদের উপর একাকী দাঁড়িয়ে আছে। মুন্না তখন মুখের কাছে হাত এনে চিৎকার করে বলল, কেউ আছো ? দূরে বহু দূরে তার কন্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে ফিরে এল। পাহাড় চূড়া যেন জবাবে বলল, কেউ আছো, কেউ আছো, কেউ আছো ?

মুন্না তখন হা হা করে হেসে উঠল।

পাহাড় চূড়ায় তার হাসির গুঞ্জরণ শোনা গেল। হা হা হা হা। মনে হল যেন সমগ্র পাহাড় এক সাথে মুন্নার সাথে হাসছে। সে ভাবল কি মজা কি মজা!

কিছুক্ষণ পর মুন্নার ক্ষুধা পেলো, সারা সকাল পথ চলে সে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। পিছনে ফিরে খাবার পুটুলি তুলতে গিয়ে সে দেখল পুটুলি নেই। মুন্নার বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে ভাবল পুটুলি গেল কোথায় ? এই মাত্র তো এখানে রাখলাম, এদিক ওদিক তাকিয়ে কোথাও সে পুটুলি দেখতে পেলনা। আশেপাশে দূরে কোন কিছুই দেখা গেল না। কি ব্যাপার ? কোথায় যেতে পারে ? খোঁজা-খুঁজির পর মুন্না ভাবল হয়ত সে ভুল করে পুটুলি অন্য কোথাও রেখেছে। ঝর্ণার তীর থেকে উঠে সে তখন বরফখণ্ডের চারদিকে পুটুলি খুঁজতে শুরু করল। চারদিকে বরফ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না, গাছ-পালা, ঘাস-পাতা ফলফুল কিছু নেই। সে খাবে কি ?

বরফ খেয়েতো আর ক্ষুধা মেটেনা, শুধু পিপাসাই মেটে, সে ছিল তখন কনুলাদের বাড়ী থেকে অনেক দূরে। সেখানে পৌঁছাতে রাত হয়ে যাবে। এত ক্ষুধা নিয়ে সে যাবেই বা কি করে? খাবারের পুটুলি খুঁজতে খুঁজতে বরফের পাহাড় উঁচু থেকে উঁচু হয়ে এল, জোরে জোরে বাতাস বইতে লাগল। মুন্না কোটের হাতল দিয়ে মুখ ঢেকে পথ খুঁজতে লাগল। কিন্তু খাবার দূরে থাক এখন পথও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সামনে পিছনে কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না। মুন্না তবু কোনক্রমে পথ চলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘ গর্জন করে বৃষ্টি শুরু হল। অল্পক্ষণ পর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে তুলার মতো বরফ পড়তে লাগল। তার গায়ের জামায় বরফ পড়েই গলে যেতো। মুন্না নীচে ফিরে যাবার পথ পাচ্ছিল না, বোঝা যাচ্ছিল না যে সে সামনের দিকে নাকি পেছনের দিকে যাচ্ছে।

হঠাৎ মুন্না প্রবল ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে গানের শব্দ পেল ঃ

বুড়ী চালায় চরকা
চরকা কাটে সুতো
আমি ঝড়ের ভূত।
আগোবাগো জাগো
আমা থেকে দূরে ভাগো
আমি ঝড়ের ভূত।

গানের শব্দের মধ্যে মুন্না একটা ছায়া দেখতে পেল। ছায়ার হাতে একটা ছোট পুটুলি, ছায়াটি পুটুলি নিয়ে পাহাড়ের এক দিকে পালিয়ে গেল।

মুন্নার ক্ষুধা তখন চরমে উঠেছে। ভূতের ভয় মন থেকে পালিয়ে গেছে। সে ভূতের পেছনে ছুট দিল। কিন্তু পথ খুবই বিপদসংকুল। বরফ পড়ছে, চারদিকে ঝড়ের প্রকোপ, মুন্না এত কিছুতেও সাহস হারাল না। ছায়ার অনুসরণ করে ছুটে গিয়ে সে পাহাড়ের অন্য পাশে চলে গেল, দেখল সেখানে বরফ পড়ছে না, ঝড়ের দাপট নেই, বরং উজ্জ্বল রোদ চকচক করছে। সে আরো দেখল কি একটা যেন তার দিকে পিছন ফিরে তারই পুটুলি থেকে খাবার খাচ্ছে।

মুন্না দ্রুত পায়ে ভূতের কাছে গিয়ে ক্রুদ্ধভাবে বলল, আমি তোমার মত ভূতটুতকে ভয় পাই না, দাও আমার খাবার ফিরিয়ে দাও।

ভূত মুন্নার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে খেতে খেতে পেছনে তাকাল।

মুন্না চিৎকার করে বলল, বাবা !

আরে এত তার বাবা। তার দাড়ি বড় হয়ে গেছে, চোখ লাল, গাল ভেঙ্গে গেছে, জামা কাপড় ছিঁড়ে গেছে। তাকে দেখতে আসলেই ভূতের মতো ভয়ানক লাগছিল।

বাবা ! মুন্না চিৎকার করে উঠল।

মুন্নার বাবা তখন তাকে চিনে ফেললেন এবং খাবার পুটুলি রেখে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর মুন্না মুন্না বলে তার মুখ চুম্বন করতে লাগলেন। তাঁর দুচোখে অশ্রুর ধারা নেমে এলো। মুন্নার চোখেও আনন্দাশ্রু দেখা দিল।

দূরে দূরে বরফস্তূপে সূর্যের আলো ঝিলমিল করছে। নীচে জঙ্গলে ময়ূর নৃত্য করছে। বুলবুলি পিতাপুত্রের মিলনের আনন্দে গান গাইতে শুরু করেছে।

সাত

পিতা পুত্রের গলাগলির পর মুন্না চোখের পানি মুছে বলল, বাবা, তুমি পালিয়ে গেলে কেন ? জবাবে তার বাবা বললেন, আমার বিরুদ্ধে ত পুলিশে বহু সাক্ষ্য প্রমাণ করা হয়েছে এবং তাদের বিশ্বাস করানো হয়েছে যে, আমিই তোমার মাকে হত্যা করেছি। সে সময় যদি পালাতে না পারতাম তবে এতদিনে আমার ফাঁসি হয়ে যেত।

ফাঁসি ! মুন্না ভয়ে তার বাবাকে আবার জড়িয়ে ধরলো।

মুন্নার বাবা তাকে আদর জানিয়ে বললেন, হাঁ খোকা, ফাঁসি। এজন্যই তো আমি সবার অলক্ষ্যে নীল পাহাড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছি। এখানে একটা অন্ধকার গুহায় পড়ে থাকি। আমার জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেছে, দাড়ি বড় হয়েছে, শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। ক্রমাগত কয়েক-দিন না খেয়ে থাকতে হচ্ছে। লোকে আমাকে ভূত মনে করে, ভয়ে কেউ এদিকে আসে না।

মুন্না বলল, কিন্তু তুমি তো ভূত নও, তুমিতো আমার বাবা।

মুন্নার বাবা কোন কথা বললেন না। নীরবে সন্তানের চুলে বিলি কাটতে লাগলেন। মুন্না কিছুক্ষণ ভেবে বলল, বাবা, তুমি আমার

সাথে কনুলাদের বাড়ীতে চলো। এখানে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। ওখানে তুমি সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে।

মুন্নার বাবা বললেন, না আমি যাব না, সেখানে গিয়ে তোমার সাথে থাকলে সবাই জেনে যাবে, তখন পুলিশ আমার পিছু নেবে এবং আমাকে গ্রেফতার করবে।

মুন্না বলল, বাবা তুমি তো সম্পূর্ণ নির্দোষ নিরাপরাধ। তবুও তুমি পুলিশকে ভয় কর কেন ?

—খোকা, আজকালকার দিনে নিরাপরাধ নির্দোষরাই মারা পড়ে বেশী এবং অপরাধীরা বেঁচে যায়। তোমার মায়ের সত্যিকার হত্যা-কারী কে সে না জানা পর্যন্ত আমার জীবন আশংকামুক্ত নয়।

—না বাবা, তুমি আমার সাথে চল। আমরা দুজনে মিলে মায়ের সত্যিকার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করব এবং তাকে পুলিশে দেব।

—তুমি খুবই ছোট, খোকা। তুমি আর কি করতে পারবে।

—আমার দেহ ছোট কিন্তু মন অনেক বড় বাবা। আমি একাকী বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছি।

—শাবাস ব্যাটা! এখন তুমি কনুলাদের ঘরে ফিরে যাও। তোমার বেশীক্ষণ এখানে থাকা ঠিক হবে না। যে-কোন সময়ে এখানে বরফ বৃষ্টি ও ঝড় শুরু হতে পারে।

না না বাবা আমি তোমাকে নিয়ে যাব। মুন্না বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল। তার বাবার চোখেও পানি এসে গেল, বাবা তাকে আদর জানিয়ে বললেন, মুন্না তুমি যাও, আমি কথা দিচ্ছি যে, প্রতিদিন গভীর রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি তোমার কাছে আসব। এবং তোমার কাছে ঘুমাব। ঠিক আছে না?

মুন্না খুশীতে মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে।

তার বাবা বললেন, তুমি কোন্ কামরায় থাক?

মুন্না বলল, আমার কামরা খুবই বড় বাবা। গ্রামে আমার ঘর যত বড় ঠিক তত বড়। আমার কামরার পেছনের দিকের জানালায় একটা সেব গাছ এর শাখা ঝুলে রয়েছে। আজ এখানে আসার সময়ে আমি জানালা থেকে প্রথমে সেব গাছের শাখায় এসেছি, তারপর নীচে নেমেছি।

তার বাবা বললেন, আমি ঠিক খুঁজে নিতে পারব। প্রতিদিন গভীর রাতে আমি সেব গাছে উঠে তোমার জানালায় টোকা দেব।

মুন্না বলল, তুমি না আসা পর্যন্ত আমার ঘুম আসবে না বাবা। আমি তোমার না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

তারপর পিতা-পুত্র গলাগলি করে বিদায় নিল। মুন্না দ্রুত পায়ে ঘরে ফিরে চলল। আজ তার মনে আনন্দ আর ধরে না। নীল পাহাড়ের ভূত আজ সত্যি সত্যিই তার ঝুড়িতে মণিমুক্তো ভরে দিয়েছে। আজ সে তার বাবাকে ফিরে পেয়েছে। যে ছেলে তার হারানো পিতাকে খুঁজে পায় তার ঝুড়ি শুধু মণিমুক্তা নয় হীরে জহরতে ভরে যায়।

সেদিন রাতে মুন্নার ঘুম এল না। প্রতিদিনের নিয়মিত সময়ের আগেই আজ সে তার কামরায় চলে এসেছে। কনুলা তাকে গল্প বলার ও শোনার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করল কিন্তু মুন্না কিছুতেই শুনল না। ঘুমের বাহানা করে আগে-ভাগে কামরায় এসে আলো নিভিয়ে সে শুয়ে শুয়ে তার বাবার প্রতীক্ষা করতে লাগল।

প্রায় অর্ধেক রাতে কে যেন চারবার জানালা খটখটালো। মুন্না তার বাবার আগমন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে জানালা খুলে দিল। তার বাবা ভেতরে এলে সে জানালা বন্ধ করে দিল। কামরায় তখন তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই।

আহা কি নরোম তুলতুলে বিছানা। মুন্নার বাবা বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে বললেন। আরো বললেন, আমি শক্ত বিছানায় শুয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। কিন্তু খোকা, ঘুম কি আসবে আমি যে ভীষণ ক্ষুধার্ত।

মুন্না তখন টেবিল ল্যাম্প প্রজ্বলিত করল। তার বাবার সাথে একত্রে খাওয়ার জন্য সে নিজের খাবার বাহানা করে তার কামরায় আনিয়ে রেখেছিল। একখানা প্লেট হাতে নেয়ার পর সেটা অসতর্কতাবশত তার হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল। মুন্না বলল, এ প্লেট সহজেই ভেঙ্গে যায় বাবা। তার বাবা রেগে গেলেন। বললেন, এ তোমাদের কেমন প্লেট খোকা? আমাদের পিতলের থালাইতো ঢের ভাল। ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেললেও ভাঙ্গে না।

দুজনে পেট ভরে খাবার পর মুন্না বলল, এস এবার ঘুমিয়ে পড়ি। তার বাবা বললেন, হাঁ তাই। আমাকে আবার খুব ভোরে উঠে চলে যেতে হবে।

তাদের কথা শেষ না হতেই কে যেন জোরে জোরে দরজার কড়া নাড়াল। মুন্না বিছানায় বসেই জিজ্ঞেস করল কে? কনুলা বাইরে থেকে বলল, আমি। তার ও মুন্নার কামরা পাশাপাশি। মুন্না দরজা খুলে দিলে কনুলা ভেতরে এসে জিজ্ঞেস করল, তুমি কার সাথে আলাপ করছিলে? মুন্না দরজা খোলার আগেই তার বাবাকে খাটের তলায় লুকিয়ে ফেলেছিল তবু কনুলার প্রশ্নে আতংকিত। বলল, কই নাতো?

কনুলা বলল, আমি তো সে রকমই শুনলাম।

মুন্না নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বলল, আরে, আমি তো নিজের সঙ্গেই আলাপ করছিলাম।

কনুলা বিস্মিত হয়ে বলল, নিজের সঙ্গে মানে?

মুন্না বলল, হাঁ হাঁ, আমি তোমার জন্য একটা গল্প মনে করছিলাম।

কনুলা খুশীতে হাততালি দিয়ে বলল, ভাল গল্প? ঠিক আছে আমাকে তাই শোনাও।

মুন্না বলল, এখনো পুরো মনে করতে পারিনি। কাল শোনাব।

হঠাৎ ভাঙ্গা প্লেটের দিকে চোখ পড়তে কনুলা বলল, এটা ভাঙ্গলো কি করে?

মুন্না বলল, আমার হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেছে।

উদ্বিগ্ন স্বরে কনুলা জিজ্ঞেস করল, তুমি ব্যথা পাওনি তো!

মুন্না হেসে বলল, না ব্যথা পাইনি। আমি চীনা মাটির তৈরি নই, গ্রামের ছেলে।

কনুলা বলল, আমার ঘুম আসছে না, এসো বড় ভালুক আর ছোট মুন্নির খেলা খেলব। তোমার মনে আছে না? সেই যে ছোট মুন্নি জঙ্গলে পথ ভুলে বড় ভালুকের ঘরে প্রবেশ করে তার সব খাবার খেয়ে ফেলে। তারপর ভালুক ফিরে এলে মুন্নি তার বিছানার নীচে লুকায়। মনে আছে না?

—হাঁ মনে আছে।

—এস সেই খেলা খেলি। আমি ছোট মুন্নি হব। তুমি বড় ভালুক হয়ে বাইরে থেকে এসে দরজা টোকা দেবে, অমনি আমি বিছানার নীচে লুকোব।

মুন্না কনুলাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, এতো রাতে আমি ওসব খেলা খেলতে পারব না। এতো রাতে জেগে থাকার কথা জানতে পারলে তোমার বাবা দুজনকেই মারবেন।

কনুলা জেদ ধরল। বলল, না আমি কিছু শুনব না, এস আমরা সেই খেলা খেলি।

কনুলা খাট থেকে নেমে নীচে লুকোতে যাবে এমন সময় মুন্না বলল, আমাদের খাটের তলায় কিছু আছে।

কনুলা ভয় পেয়ে এক দৌড়ে কামরার বাইরে চলে গেল।

মুন্না বলল, হাঁ তিনটা বিচ্ছু আর দুটো ইঁদুর আছে।

কনুলা বলল, হায় দুটো ইঁদুরও আছে?

মুন্না তখন কামরার বাইরে গিয়ে কনুলাকে ধরে বলল, যেওনা এস মুন্নি ভালুক খেলা খেলব।

কনুলা বলল না ভাই আমি খেলব না। এই বলে নিজের কামরায় গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

মুন্না তার কামরায় ফিরে এল এবং খাটের নীচে উঁকি দিয়ে বলল, বেরিয়ে এস বাবা, এখন সারারাত কেউ আর এদিকে আসবে না।

মুন্নার বাবা খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এসে মুন্নার চোখে-মুখে হাসি দেখে বলল, তুমি আদতেই খুব দুষ্ট হয়ে গেছ। বুদ্ধি সুদ্ধিও হয়েছে ঢের। আমি তো ভেবেছিলাম আজ ধরা পড়ে যাব।

মুন্না বলল, বাবা এবার আরাম করে ঘুমাও, সারা রাত এদিকে আর কেউ আসবে না।

তারপর পিতা-পুত্র গলাগলি করে শুয়ে পড়ল।

আট

শেষ রাতের দিকে মুন্নার মনে হল কে যেন তাকে ঘুম থেকে জাগাচ্ছে। মুন্না ভয় পেয়ে জেগে গেল এবং বলল, কে, কে? তার বাবা তার মুখে হাত দিয়ে বললেন, চুপ, চুপ, কথা বল না, আমি এখন চলে যাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকাল হয়ে যাবে।

মুন্না জানালা খুলে দেখল বাগানে তখনো অন্ধকার, সে বলল, এখনো অনেক রাত, তুমি যেও না বাবা। এই বলে সে তার বাবার হাত ধরল।

তার বাবা বললেন, না আমাকে এখন যেতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকাল হয়ে যাবে, তখন আমাকে সবাই চিনে ফেলবে।

এ সময়ে দূরে মোরগের ডাক শোনা গেল। শুনলে? তার বাবা বললেন, এবার আমাকে যেতে দাও।

মুন্না তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কাল আবার আসবে না বাবা?

—হাঁ অবশ্যই আসব।

অনেক কষ্টে পুত্রের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে মুন্নার বাবা জানালা দিয়ে সেব গাছের শাখায় উঠে নীচে নামলেন। মুন্না তার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে দেখল দূরে একটা কালো ছায়া মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে তার বাবা

সশব্দে পড়ে গেলেন। এতে বাগানে প্রহরার চৌকিদার উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞেস করল কে?

মুন্নার বাবার বুক কেঁপে উঠল। ভয়ে তিনি মুখে হাত চাপা দিলেন।

যেদিক থেকে পতনের শব্দ হ'ল চৌকিদার দ্রুত সেদিকে অগ্রসর হ'ল। তাকে দেখে মুন্নার বাবা দ্রুত দৌড়াতে শুরু করলেন।

চৌকিদার চোর চোর বলে চিৎকার করল। চিৎকার শুনে একজন পুলিশ টর্চ নিয়ে এগিয়ে এল।

পুলিশের নাম শুনে মুন্নার বাবা আরও জোরে দৌড়াতে শুরু করলেন। তাকে কালো ছায়ার মতো পলায়নপর দেখে পুলিশ বন্দুক তাক করে বলল, হল্ট! না হলে গুলী করে দেব।

মুন্নার বাবা আরও জোরে দৌড়াতে লাগলেন। এ সময়ে মুন্না জানালা খুলে বাইরে ছুটে এসে বলল, গুলী করবেন না, উনি আমার বাবা।

ততক্ষণে গুলী বর্ষণ করা হয়েছে। মুন্নার বাবা সশব্দে মাটিতে পড়ে গেলেন। হায় বাবা, বাবা, মুন্না চিৎকার করে উঠল। সবাই মুন্নার বাবাকে ঘিরে ধরল। মুন্না দৌড়ে গিয়ে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরলো। এবং কেঁদে কেঁদে বলল, বাবা বাবা!

মুন্নার বাবা গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন, ভাগ্য ভাল তাঁর গায়ে গুলী লাগেনি, কানের লতিতে লেগে কান উড়ে গেছে এবং ক্রমাগত রক্ত ঝরছে। মুন্নার কান্না দেখে তিনি বললেন, কেঁদনা বাবা, আমি ভাল আছি। দেখ আমি বেঁচে আছি।

মুন্না তার বাবার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

পুলিশ মুন্নার বাবাকে দেখে চিনে ফেলল। বলল, আরে এ তো মধুপুর গ্রামের খুনী ঠাকুর সিং, আপন স্ত্রীকে হত্যা করে সে পালিয়ে গেছে।

মুন্না চিৎকার করে প্রতিবাদ করল, মিথ্যে কথা, আমার বাবা খুনী নয়, তিনি নির্দোষ।

পুলিশ মুন্নাকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে তার বাবার হাতে শিকল পরিয়ে দিল। বলল, নির্দোষী কি দোষী সে বিচার হবে আদালতে। সে খুনী না হলে পালাবে কেন?

হৈ চৈ শুনে কনুলা এবং তার বাবাও ঘটনাস্থলে পৌঁছুলেন। মুন্না কেঁদে কেঁদে কনুলার বাবাকে বলল, আমার বাবা খুনী নয়, তিনি কোন খুন করেননি। আমার বাবাকে ছাড়িয়ে দিন শেঠজী।

কিন্তু শেঠজী ও কনুলা কারও কিছু করার ছিল না। তাছাড়া মুন্নার বাবা আটকা বাঁধন থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পুলিশ তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আদালতের রায় ছাড়া তাঁর নির্দোষিতা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তার আগে পুলিশের হাত থেকে তাঁকে ছাড়ানোও সম্ভব নয়।

কনুলার বাবা মুন্নাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ভয় পেওনা, তোমার বাবা যদি নির্দোষ হয় তবে আমি তাকে আদালত থেকে অবশ্যই ছাড়িয়ে আনব। কিন্তু একথায় মুন্না সান্ত্বনা পেল না। সে আর জোরে জোরে কাঁদতে লাগল। সে বলল, আমার বাবাকে ছেড়ে দাও, আমার বাবাকে ছেড়ে দাও।

কিন্তু আইনের ব্যাপারে সুপারিশে কোন কাজ হয় না। এজন্য পুলিশ মুন্নার বাবাকে ফাঁড়িতে নিয়ে বন্দী রাখল। পরদিন তাঁকে বড় শহরের জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়া হল। মুন্না জেদ ধরল তার বাবা যেখানে যাবে সেও সেখানে যাবে। কনুলাও মুন্নার বাবার সাহায্য করতে চাচ্ছিল এজন্য সে তার বাবাকে শহরে যেতে রাজি করাল। পরদিন মুন্নার বাবার সাথে মুন্না, কনুলা, তার বাবা, তাদের চাকর-বাকর সবাই শহরে চলে গেল। শহরে শেঠজীর একটা বিরাট বাড়ী ছিল, সে বাড়ীতে মুন্না সহ সবাই অবস্থান করল। তার বাবাকে হাজতে পাঠিয়ে দেয়া হল।

এর আগে মুন্না কখনও শহর দেখেনি। কিন্তু শহরের বৈচিত্র্য তাকে এতটুকু আকর্ষণ করতে পারেনি। কনুলা তাকে পাকা সড়ক, বিজলী-বাতি, মোটর গাড়ী, ট্রেন ইত্যাদি অনেক কিছু দেখালো কিন্তু মুন্না কোন কিছুতেই উৎসাহ বোধ করল না, সে শুধু বলছিল আমার বাবা নির্দোষ আমার বাবা খুনী নয়। তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।

মুন্নার বাবার মামলার জন্য কনুলার বাবা শহরের শ্রেষ্ঠ উকিল নিয়োগ করলেন। চার মাস পর্যন্ত মামলা চলল। কিন্তু সব সাক্ষ্য প্রমাণ মুন্নার বাবার বিরুদ্ধে থাকায় কোন অবস্থায়ই তাকে নির্দোষ প্রমাণ করা গেল না। অবশেষে আদালত মুন্নার বাবাকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির শাস্তির আদেশ ঘোষণা করল। হাইকোর্টের রায়ের পর কনুলার বাবা সুপ্রীম কোর্টে আপীল করলেন কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। তারপর ফাঁসির তারিখ নির্ধারণ করা হল। জানিয়ে দেয়া হল যে, এখন থেকে সাত দিন পর দেয়ালী উৎসবের আগের দিন মুন্নার বাবাকে ফাঁসি দেয়া হবে।

আদালতের রায় ঘোষণার পর মুন্নার মাসী ও তার স্বামী শামু মুন্নাকে তাদের হেফাজতে নেয়ার চেষ্টা করলো। মুন্নার মাসী

অনেক মায়া কান্না কাঁদল। সে বলল, মুন্না আমার বোনের ছেলে, এজন্য তাকে আমার সাথে গ্রামে পাঠিয়ে দিন।

কিন্তু মুন্না কিছুতেই তার মাসীর সাথে যেতে রাজি হল না। সে বলল, আমি কনুলাদের কাছে থাকব। আদালত মুন্নার মাসীর আবেদন নাকচ করে মুন্নাকে কনুলার বাবার হাতে সোপর্দ করল। মুন্নার মাসী ও তার স্বামী গ্রামে ফিরে গেল। মুন্নার মাসী তার বাবার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ায় মুন্না ভীষণ ক্রুদ্ধ হল। সে ভেবে পেলনা তার মাসী কি করে বলল যে, বাবা মার সাথে ঝগড়া করতেন এবং তাকে যখন-তখন প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিতেন। শামু তার স্ত্রীর কথা সমর্থন করল। তাদের দুজনের সাক্ষ্যের কারণেই ঠাকুর সিং-এর প্রতি আদালতের সন্দেহ বদ্ধমূল হল। জুরীরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, ঠাকুর সিংই তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে। অথচ মুন্না জানতো এসবই মিথ্যা। তার বাবা তার মাকে কী গভীরভাবে ভালবাসতেন সেটা তার চেয়ে কে জানবে? ঠাট্টা-মস্করা করেও তিনি স্ত্রীকে কোনদিন একটা চড় পর্যন্ত দেননি। এরকম লোক কি তার স্ত্রীকে খুন করতে পারে?

আদালতের রায় শোনার পর শামু স্ত্রীকে নিয়ে গ্রামে ফিরে গেল। তাদের আনন্দ আর ধরেনা। সাত-আটদিন পর ঠাকুর সিং-এর ফাঁসী হয়ে যাবে, মুন্নাতো অপ্রাপ্তবয়স্ক, কাজেই ঠাকুর সিংএর জায়গা-জমি, গরু-বাছুর সব শামু ভোগ করতে পারবে। গ্রামে যাবার পর তারা আনন্দের আতিশয্যে ভাল খাবার আয়োজন করল। রাতে শোয়ার সময় মুন্নার মাসী তার স্বামীকে বলল, এবার আমি রূপার চুড়ি আদায় করব।

শামু বলল, আরে রূপার কি বল, তোমাকে সোনার চুড়ি তৈরি করে দেব, আগে ঠাকুর সিং-এর ফাঁসি হয়ে যাক। আইনত সব কিছু আমাদের অধিকারে এলে কোন কিছুরই অভাব থাকবে না।

মুন্নার মাসী সন্দিগ্ধভাবে বলল, কিন্তু মুন্নাতো বেঁচে আছে। তার মা-বাবা মরে গেছে তো কি হয়েছে, তার বাবার জায়গা জমি তো সে-ই পাবে।

শামু অট্টহাসি হাসল। বড় ভয়ানক সে হাসি। বলল, বাবা-মা না থেকে মুন্না থাকলেই বা কি? একদিন দেখবে মুন্নাও আর বেঁচে নেই। তুমি শামু সিংকে জানো না?

মুন্নার মাসী খুবই সাহসী নারী, কিন্তু সে মুহূর্তে স্বামীর প্রতি তাকিয়ে তারও ভয় হল। কোন কথা না বলে সে চুপচাপ শুয়ে ঘুমিয়ে গেল।

ঠাকুর সিং-এর ফাঁসির আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি। শহরের বাড়ীতে মুন্না ও কনুলাকে রেখে শেঠজী কি একটা কাজে গ্রামের বাড়ীতে গেলেন। মুন্না ও কনুলার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখার জন্য তিনি চাকরদের নির্দেশ দিয়ে গেলেন। মুন্না সে সময়ে সারাদিন কান্নাকাটি করত। শুকিয়ে সে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। পানাহার, জামাকাপড় কোন কিছুর প্রতি তার খেয়াল নেই। সে শুধু ভাবত, হায়, বাবা জেলখানার অন্ধকার কামরায় জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাচ্ছেন।

দিন কেটে চলল। মৃত্যুর প্রহর ক্রমেই ঘনিয়ে এল।

একদিন কেটে গেল।

দুই দিন কেটে গেল।

তিনদিন কেটে গেল।

চার দিন কেটে গেল।

কাল সকালে মুন্নার বাবাকে জেলখানার চার দেয়ালের ভেতর ফাঁসি দেয়া হবে।

শেঠজী মুন্নার বাবাকে বাঁচাবার জন্য সম্ভাব্য সব রকম চেষ্টা করলেন কিন্তু কোন চেষ্টাই ফলপ্রসূ হল না। এখন আর তার জীবনের কয়েক ঘন্টা মাত্র বাকি। মুন্নাকে তার বাবার সাথে শেষ বারের মত সাক্ষাতের সুযোগ দেয়া হল। কেঁদে কেঁদে তার চোখ মুখ ফুলে গিয়েছিল, গলা বসে গিয়েছিল। পিতার কোলে বসে সে থর থর করে কাঁপছিল। তার বাবাও কাঁদছিলেন। আর চোখের পানি মুছে মুন্নাকে বলছিলেন, ভগবান সাক্ষ্য রয়েছেন, আমি নির্দোষ, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু দুঃখ যে আমি দোষী সাব্যস্ত হয়ে মারা যাচ্ছি।

মুন্না বলল, বাবা তুমি নির্দোষ হলে ভগবান কেন শুনলেন না? তিনি কেন তোমাকে রক্ষা করেন না? কেমন ভগবান যিনি গরীবদের কথা শোনেন না? বাবা! বাবা!

অশিক্ষিত কৃষক ঠাকুর সিং বললেন, বাবা, এও তাঁর এক লীলা।

মুন্না তার বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, বাবা, যদি তোমার বদলে আমাকে ফাঁসি দেয়া হয় তবে কি তুমি রেহাই পাবে?

ঠাকুর সিং পুত্রকে বুকের সাথে মিশিয়ে বললেন, তোমার কিছু যেন না হয় এই আমি চাই। আমার পরে তুমিই আমার বংশের নাম রাখবে। আমি মৃত্যুকালে তোমাকে এই আশীর্বাদ করব। আমি ভগবানের কাছে বলব, যে অন্যায় আমার সাথে হয়েছে তোমার সাথে তা যেন হতে না পারে।

কিছুক্ষণ পর সাক্ষাতের সময় শেষ হয়ে এল। জেলের ওয়ার্ডার এসে মুন্নাকে বলল, এবার তুমি যাও।

শেষ বারের মত ঠাকুর সিং পুত্রকে আদর করলেন এবং প্রিয় কুকুর ডুব্বুর মাথায় হাত রাখলেন। মুন্নার সাথে কুকুরটিও তার প্রভুকে শেষ বারের মত দেখার জন্য জেলখানায় গিয়েছিল। সে

বারবার লেজ নাড়ছিল এবং জিহ্বা বের করে মালিকের পা চাটছি
তারপর অন্য দিকে ফিরে কিছুক্ষণ কাঁদল, সম্ভবত কুকুরও জে
ফেলেছিল যে, তার মালিকের জীবনের শেষ সময় এসে পড়েছে

অনেক চেষ্টার পর জোর পূর্বক ওয়ার্ডার মুন্না ও ডুব্বুকে ঠা
সিং-এর নিকট থেকে নিয়ে গেল, বাইরে তখন কনুলা গাড়ীতে ব
তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

মুন্না দেখল কনুলা আস্তে আস্তে গাড়ী চালাচ্ছে। সে বিস্
হল, বলল, আরে, তুমি মোটরও চালাতে পার?

---হুঁ। ড্রাইভারের কাছে শিখেছি, কিছু কিছু পারি।

---তুমি চালালে আমার ভয় হয়। তুমি ড্রাইভারের কাছে দা

উভয়ের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন ছিল খুবই গভীর। মু
তুচ্ছ একটা কথাও কনুলা পালন করতে দ্বিধা করত না। মু
বলার সঙ্গে সঙ্গে কনুলা ড্রাইভিং সিট থেকে উঠে ড্রাইভারকে জা
দিয়ে দিল।

যতো কিছুই হোক মুন্না ছিল শিশু, কনুলাকে মোটর চালাতে দে
সে কিছুক্ষণের জন্য বাবার কথা ভুলে গেল। ড্রাইভিং সিট থে
তার কাছে এসে বসে হাত ধরতেই মুন্না আবার তার জ্বালাময় স্মৃতি
ফিরে গেল।

কনুলা তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার বাবা কি বললেন?

মুন্না কোন কথা বলল না। তার দুচোখে অঝোর অশ্রুর ধা

কনুলা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তোমার বাবা খুবই জ্ঞানী মা
তিনি ভগবানের কাছে যাবেন। তিনি স্বর্গে যাবেন।

মুন্না বলল, কিন্তু আমাকে একাকী রেখে কেন যাচ্ছেন? প
মা গেলেন, তারপর বাবা যাচ্ছেন। কিন্তু কেন, বল কেন?

কনুলা চুপ করে গেল। সে কি জবাব দেবে, কেউ কি তার প্র
উত্তর দিতে পারবে?

কিছুক্ষণ পর শেঠজীর বাড়ী এসে পড়ল। উভয়ে গাড়ী থে
নেমে ভেতরে চলে গেল।

দিন কেটে গিয়ে বিকেল হল। তারপর রাত এল, ক
আজ মুহূর্তের জন্যও মুন্নার সঙ্গ ছাড়েনি। ছায়ার মত তার স
সাথে থেকেছে। রাতের খাবার সময়ে অনেক চেষ্টা করেও মুন্

। এক গ্রাসও খাওয়াতে পারেনি। কিছু না খেয়েই মুন্না বিছানায় য়ে পড়েছে। কনুলা তার কাছে একটা আরাম কেদারায় গিয়ে য়ন করল। মুন্নার দুঃখ কনুলার সহ্য হচ্ছিল না কিন্তু সে কি করে কে সাহায্য করবে? কিছুই তার বুঝে আসছিল না। এজন্য ীরবে সমবেদনামূলক চোখে সে মুন্নার প্রতি তাকিয়ে রইল। ন্নুলার চোখও অশ্রুতে ভিজে আসছিল কিন্তু সে কি করতে পারত?

কাঁদতে কাঁদতে এক সময়ে মুন্না ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের ঘোরে স স্বপ্ন দেখল। দেখল একটা বিরাট কামরা। সে কামরার একটা ক্তপোষে তার মা শুয়ে আছেন, তাঁর হাত পা বাঁধা। তিনি মুন্নাকে লছেন,

মুন্না তুমি ছুটে এসে বাঁচাও আমার প্রাণ
কালো কালো ভোমরা আছে,
সাত তোহাসের কামরা আছে
লাল মুকুটের রাজা আছে
উল্টো হাতের রাজা আছে
মুন্না তুমি ছুটে এসে বাঁচাও আমার প্রাণ।

স্বপ্ন দেখে মুন্না চিৎকার দিয়ে বলল, মা মা আমি আসছি। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে দেখল সেই কামরা নেই, তক্ত পোষও নেই, তার মাও নেই, সে শেঠজীর বাড়ীতে একটা কামরায় শুয়ে আছে। ধড়মড় করে সে বিছানায় উঠে বসল, কনুলা ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মুন্নার সারা দেহ ভিজে সপসপে হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সে কনুলাকে ডেকে বলল, কনুলা! কনুলা!

—বল, কি?

—শোনো, এইমাত্র আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম।

—ভয়াবহ স্বপ্ন হলে আমার কাছে বলোনা।

—না, ভয়াবহ নয়। তবে আগেও একবার এ স্বপ্ন আমি দেখছি।

—কোথায়?

—আমাদের গ্রামে। যেদিন আমার মা খুন হয়েছিলেন সেদিন।

—কি রকম স্বপ্ন?

—আমি দেখি কি, একটা বিরাট কামরা, সে কামরায় একটা তক্তপোষে কে যেন আমার মাকে বেঁধে রেখেছে। মা আমাকে সাহায্যের জন্য ডাকছেন।

—কি বললেন তোমার মা ?

—তিনি বললেন ঃ

মুন্না তুমি ছুটে এসে বাঁচাও আমার প্রাণ।

—কিন্তু মৃত মানুষের প্রাণ বাঁচানো কি করে সম্ভব ?

—মা আরো বললেন,

সাত তোহাসের কামরা আছে
কালো কালো ভোমরা আছে
লাল মুকুটের রাজা আছে
উল্টো হাতের রাজা আছে
মুন্না তুমি ছুটে এসে বাঁচাও আমার প্রাণ।

—আমার মনে হচ্ছে মা এখনো আমাকে সত্যি সত্যি সাহায্যের জন্য ডাকছেন।

—আগের বারও একই স্বপ্ন দেখেছিলে ?

—হাঁ। ঠিক একই রকম। সে তো অনেক দিন হল। এখনও সব মনে আসছে।

—তোমাদের গ্রামে কোন লাল মুকুটের রাজা আছে ?

—রাজা, উজির কিছু নেই, আমাদের গ্রামে যারা বাস করে তারা সবাই কৃষক।

—উল্টা হাতের রাজা—বাজনা আছে ?

—কি যা তা বলছ। উল্টো হাতে আবার বাজনা থাকে নাকি ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—তোমাদের গ্রামে সাত তোহাসের কোন কামরা আছে ?

—আরে না না। ওখানে সব কুঁড়ে ঘর। এক বা দু' কামরা বিশিষ্ট ঘর। সাত তোহাস বা সাত কামরা কোথাও নেই। তবে হাঁ মুন্না কিছুক্ষণ ভেবে বলল, মন্দিরের শিবালয়ে যেখানে দেবতার মূর্তি রয়েছে সেখানে সাত তোহাসের কামরা আছে।

—মন্দিরের শিবালয়ে ? সেখানে সাত তোহাসের কামরা আছে ? আমাদের তো তাহলে শীগগির সেখানে যেতে হচ্ছে।

—হাঁ হাঁ যাবো। নিশ্চয়ই সেখানে কোন কিছু রয়েছে।

—আমিও তোমার সাথে যাবো।

—কিন্তু এখান থেকে সেখানে যাব কি করে? ঘর থেকেই বা বেরোবো কি করে? বাইরে পাহারাদার বসে আছে।

—ওরা সবাই এখন ঘুমুচ্ছে। এত রাতে কে জেগে থাকে? আমরা আস্তে করে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাব।

—কিন্তু গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছাবো কি করে? গ্রাম তো শহর থেকে অনেক দূরে।

—তুমি ভেবনা, আমি তোমাকে মোটরে চড়িয়ে নিয়ে যাব।

—তুমি মোটর চালাতে পারবে?

—চালাব না।

—না না চালাও, অবশ্যই চালাও। এছাড়া কোন উপায় নেই। তাড়াতাড়ি কর।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মুন্না ও কনুলা তৈরি হয়ে নিল। গ্যারেজের পাশে ড্রাইভার ঘুমিয়েছিল। কনুলা সতর্কভাবে তার পকেট থেকে চাবি বের করে নিল। চাবি বের করেই কনুলা চিন্তায় পড়ে গেল। বলল, গ্যারেজ থেকে মোটর বের করলে ড্রাইভারতো জেগে যাবে।

মুন্না বলল জাগলে কি হবে? সে তো আর পায়ে হেঁটে আমাদের পেছনে যেতে পারবে না। আমরা ততক্ষণে অনেক দূরে চলে যাব।

গ্যারেজ থেকে মোটর বাইরে বের করার সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার জেগে গেল এবং চিৎকার করে মোটরের পিছনে ছুটলো, গাড়ী ততক্ষণে ফুল স্পীডে ছুটে চলেছে। বাড়ীটা ছিল শহর থেকে কিছু দূরে, এজন্য কোথাও পুলিশ চেকিং-এরও ভয় ছিল না।

কনুলা আস্তে আস্তে সতর্কতার সাথে গাড়ী চালাচ্ছিল। মুন্না তাকে অস্থির ভাবে বলল, গ্যারেজ থেকে বের করার পর যেমন চালিয়েছ সেরকম চালাও।

কনুলা বলল, যদি অন্য কোন গাড়ীর সাথে ধাক্কা লাগে বা রাস্তার বাইরে গিয়ে পড়ে তখন কি হবে?

মুন্না বলল, এতো ভয় পেলে চলে? ভয় পেওনা জোরে চালাও।

কনুলা গাড়ীর গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই গঙ্গাপুর এসে পড়ল। এখানে পাকা রাস্তা শেষ হয়ে কাঁচা রাস্তা শুরু হয়েছে। গঙ্গাপুর থেকে মধুপুরের দূরত্ব বিশ মাইল, কনুলা বলল, এখন এত পথ যাবে কি করে? অন্য কোন যানবাহন দেখা যায় না?

মুন্না বলল, এতক্ষণে রাত শেষ হয়ে যাবে যে !

তাহলে কি করব ?

---এ মোটরকেই কাঁচা রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাও। ঘোড়ার গাড়ী চলতে পারলে মোটর চলতে পারবে না কেন ?

---না, মোটর চলতে পারবে না।

---কেন চলতে পারবে না ? আমি তোমার সাথে বসে আছি, তুমি চালাও তো !

কনুলা কাঁচা রাস্তায় মোটর নিয়ে গেল বটে তবে বলল, দুর্ঘটনা ঘটবে, তখন আমরা দুজনেই মারা যাব দেখে নিও।

—না মরব না, মরব না। তুমি চালাও তো। মুন্না অধৈর্যভাবে বলল।

গাড়ী কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে দোল খেতে খেতে এগিয়ে চলল। কয়েকবার উল্টো যেতে যেতে বেঁচে গেল। তারা একে অন্যের গায়ের উপর গিয়ে পড়ল, গরুর গাড়ী ঘোড়ার গাড়ীর সাথে কয়েকবার সংঘর্ষ হতে হতে বেঁচে গেছে। কিন্তু কোন প্রকার দুর্ঘটনা ব্যতীতই তারা প্রায় সব পথ অতিক্রম করল। গন্তব্য স্থলে পৌঁছার এক মাইল এদিকে গাড়ী একটা বড় গর্তে আটকে গেল, কিছুতেই সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হল না।

উভয়ে গাড়ী থেকে নেমে এলে কনুলা গাড়ীর ক্ষতি হয়েছে কিনা দেখতে লাগল।

মুন্না বলল, রাখো তোমার গাড়ী, প্রাণ বেঁচেছে এইতো যথেষ্ট। এখন শিবালয়ের দিকে চল।

তারপর তারা হাত ধরাধরি করে শিবালয়ের দিকে এগিয়ে চলল। উভয়ে গরম পোশাক পরে এসেছিল, তবু শীতের প্রকোপে থরথর করে কাঁপছিল। শিবালয়ের দরজায় পুরোহিত গঙ্গারাম ও যমুনারাম ঘুমিয়েছিল। তাদের গায়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে ওরা শিবালয়ে প্রবেশ করল। শিবালয়ের ভেতরের যে কামরার মূর্তি রাখা হয়েছে সে কামরাটি ছিল খুব বড়। দেয়ালে দেয়ালে আরো অনেক ছোট ছোট মূর্তি রয়েছে। মন্দিরে প্রদীপ ও ধূপ জ্বলছে। চারদিকে প্রচ্ছন্ন নীরবতা। মুন্না ও কনুলা প্রথমে নত হয়ে মূর্তিকে প্রণাম করল, তারপর এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। কনুলা বলল, সত্যিই তো এখানে সাত তোহাসের কামরা রয়েছে। তারপর উভয়ে ঘুরে ফিরে

দেখলো, কিন্তু তেমন কিছু দেখতে পেলনা। হতাশ হয়ে ফিরে আসতে যাবে এমন সময়ে দেয়ালে খোদাই করা একটা পাথরের দিকে মুন্নার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। দেখল সেটা শকুন্তলার ছবি। শকুন্তলা ঘাসের উপর তার প্রেমিকাকে চিঠি লিখছে, একটা কালো ভ্রমর তার মুখের কাছে উড়ছে।

মা কি না বলেছিল? কনুলা মুন্নাকে জিজ্ঞেস করল।

মুন্না বলল,

সাত তোহাসের কামরা আছে
কালো কালো ভোমরা আছে,

কনুলা বলল, হায়, একি অদ্ভুত মিল! দেখ সাত তোহাসের কামরা রয়েছে, আবার এ ছবির উপর কালো কালো ভ্রমর উড়ছে।

মুন্না ভেবে বলল, দুটো কথা তো সত্য হয়েছে। তারপর মনোযোগ দিয়ে ছবি দেখতে লাগল। যেন সে ছবির মধ্যেই সে তার মাকে খুঁজছে। কিন্তু মাকে পাবে কোথায় সেটা তো শকুন্তলার ছবি। মুন্না ছবির উপর আঙুলের স্পর্শ লাগিয়ে ভ্রমরটিকে ধরে ফেলল। হায়, সঙ্গে সঙ্গে ছবিটি উধাও হয়ে গেছে। ছবির স্থানে একটা পাথরের দরজা খুলে গেছে। তারা উভয়ে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর তারা দরজার ভেতর উঁকি দিয়ে দেখল ভেতরে এক সারি সিঁড়ি রয়েছে। শেষ প্রান্তে একটা পাথরের দরজা দেখা যাচ্ছে। দরজাটি দূরে থেকে খুবই ছোট দেখাচ্ছে।

কনুলা বলল, হায়, আমারতো এখন ভয় হচ্ছে।

মুন্না তার হাত ধরে বলল, এতো পথ যখন এসেছি, সামনেও যেতে হবে।

তাদের ভেতরে প্রবেশ করতেই দরজা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তারা হাতিয়ে হাতিয়ে নীচে নামছে। হঠাৎ করে কনুলার মনে পড়লো যে তার পকেটে টর্চ লাইট রয়েছে। তারপর টর্চ জ্বালিয়ে উভয়ে নীচে নামতে লাগলো। তাদের দুপাশে দেয়ালে দেব-দেবীদের মূর্তি অঙ্কিত রয়েছে। সিঁড়ি অতিক্রম করে শেষে দরজার কাছে পৌঁছে তারা দেখল দরজা বন্ধ। দেখে মনে হচ্ছিল যেন বহু বছর থেকে এ দরজা কেউ খোলেনি। তাও প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যেন একটা ছবি, দরজা বলে মনে হয় না। দরজার চারদিকে এক ঝাঁক কালো কালো ভ্রমর বসে আছে।

কনুলা বলল, দেখ দেখ কালো ভ্রমর এখানেও রয়েছে।

মুন্না হতাশ ভাবে বলল, কিন্তু লাল মুকুট কোথায়? উল্টো হাতের বাজনাই বা কোথায়?

হঠাৎ সরস্বতী দেবীর মূর্তির প্রতি তাকিয়ে মুন্না দেখল তার উল্টো হাতে বাজনা রয়েছে।

উভয়ে এদিক ওদিক দেখে গভীরভাবে মূর্তিটির প্রতি তাকিয়ে দেখল। কিন্তু কোথাও কিছুই দেখতে পেলনা। হতাশাক্লিষ্ট হৃদয়ে মুন্না দেবীর চরণে মাথা রেখে বলল, বল দেবী, আমাকে বল কোথায় সেই লাল মুকুট। লাল মুকুট দেখতে পেলে সম্ভবত আমাদের কাছে সব রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে. বল বল দেবী।

দেবীর চরণ থেকে মুন্না তখনো মাথা তোলেনি, এমন সময় একটা প্রচণ্ড শব্দ হল। তারা দেখল নীচের সমতল ভুমির মাঝে একটা ছিদ্র দেখা যাচ্ছে। সে ছিদ্র এত ছোট যে বড় জোর একটা হাত প্রবেশ করানো যায়। যেই ফাঁকের ভেতর হাত দিতে যাবে এমন সময় কনুলা তাকে বাধা দিয়ে পকেট থেকে টর্চ জ্বালিয়ে ভেতরের দিকে তাকাল।

মুন্না সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, ভেতরে কি?

কনুলা বলল কিছুনা; মাত্র একটা চাবি।

মুন্না তখন কনুলাকে এক পাশে সরিয়ে ফাঁকের ভেতর হাত দিয়ে চাবি বের করল। টর্চের আলোয় দেখে মনে হলো চাবিটা সোনার তৈরি। চাবির গায়ে একটা লাল মুকুট অঙ্কিত রয়েছে।

হায় লাল মুকুট! কনুলা বিস্মিতভাবে বলল,—হায় লাল মুকুট!

মনে হল যেন চারদিকে থেকে মূর্তিসমূহ লাল মুকুট বলে চিৎকার করে উঠেছে। আসলে কিন্তু তা নয়, কনুলার কণ্ঠস্বরেরই প্রতিধ্বনি। মুহূর্তের জন্য কনুলা ভয় পেল।

মুন্না বলল, এতো তোমারই কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি, অন্য কেউ এখানে নেই। আস্তে করে বল।

তারপর চাবি হাতে নিয়ে উভয়ে পাথরের দরজার দিকে অগ্রসর হল। মুন্না দরজার ফাঁকে চাবি লাগিয়ে জোরে ঘুরাতেই দরজার একটা অংশ দেয়ালের মধ্যে সেঁধে গেল। চাপা পায়ে ভেতরে প্রবেশ

করেতেই তারা দেখলে যে, একটা বিরাট কামরা, সে কামরার এক কোণে একটা তক্তপোষ, তক্ত পোষের উপর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একজন নারী কাতরাচ্ছে।

মুন্না মা মা বলে চিৎকার করে তক্তপোষের দিকে অগ্রসর হল। বলল, মা আমার, মা তুমি বেঁচে আছো? এই বলে মুন্না মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

খোকন, খোকন সোনা, সোনা মানিক আমার বলে মুন্নার মা তার মুখ চুম্বন করতে লাগল, হাত-পা বাঁধা থাকায় মুন্নাকে জড়িয়ে ধরতে পারল না।

মুন্না ও কনুলা তাড়াতাড়ি বাঁধন কেটে মাকে মুক্ত করল। মা তাদেরকে তার বন্দী হওয়া পর্যন্ত সব কাহিনী শোনালেন। শামু

াকে এখানে বন্দী করে রেখেছে, সে দুষ্ট তিন দিন পর পর এসে াবার দিয়ে যায় কিন্তু মুক্ত করে না। আমি আজো বুঝতে পারলাম া যে সে আমাকে এখানে কেন আটকে রেখেছে।

মুন্না বলল, মা শোন তোমাকে বলছি। মাসীর স্বামী আমাদের মি দখল করতে চায়। তোমাকে এখানে বন্দী রেখে তোমার হত্যার পবাদ বাবার ঘাড়ে চাপিয়ে বাবাকে ফাঁসি দেয়ার ব্যবস্থা করবে। ারপর তোমাকে এখানে উপোস করায়ে মারবে—এই ছিল তার ষড়যন্ত্র। খন আমি একটা ছোট্ট ছেলে থেকে যেতাম, আমাকেও মেরে ফেলে ারপর জায়গা-জমি, সব ভোগ করবে। কিন্তু সেই খুনী জালিম ানে না যে, শিশুরা কত বড় চালাক।

মা মুন্নার মুখে চুমু খেয়ে বললেন, বাবা, তুমি খুবই বাহাদুর। তামার সাথে এই মেয়েটি কে?

মুন্না বলল, ও হলো গিয়ে কনুলা। আমার বন্ধু। ও আমাকে নেক সাহায্য করেছে। ও না হলে আমি এ পর্যন্ত পেঁীছুতে পারতাম া।

মা কনুলার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন।

হঠাৎ মুন্না বলল, মা এখানে আর দেরী করা যাবে না, শীগগির ল আজ সকালে বাবার ফাঁসি হবে।

ফাঁসি! হায়, কেন ফাঁসি হবে? মা ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন।

মুন্না বলল, তোমাকে হত্যা করার অপরাধে। মাসীর স্বামী শামু তামাকে এখানে আটকে রেখে তোমার হত্যার অভিযোগে বাবাকে গ্রফতার করায়। আজ সকালের মধ্যে যদি আমরা শহরে না পৌঁছতে পারি তাহলে বাবার ফাঁসি হয়ে যাবে। আমরা কিছুতেই তার জীবন রক্ষা করতে পারব না।

মুন্নার মা তাড়াতাড়ি দরজার দিকে ছুটে গিয়েই আবার থমকে াঁড়ালেন। মুন্না ও কনুলা তাঁকে অনুসরণ করল। কিন্তু একি! কাঁধে ধারালো কুঠার নিয়ে মুন্নার মাসীর স্বামী শামু চোখ লাল করে াঁড়িয়ে আছে, মুন্নার প্রতি তাকিয়ে সে ক্রোধভরে বলল, বদমাশ কাথাকার! তুই এ পর্যন্ত পেঁৗছেছিস? তোর মাকে জীবিত রেখে আমি ভুল করেছি। বৌএর বোন মনে করে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম কিন্তু এখন আর আমার হাত থেকে তোদের রক্ষা নেই। তোদের

মা ছেলেকে আজ আমি খুন করব। সকালে তোর বাবার ফাঁসি হবে। তারপর সব জায়গা-জমি আমার হাতে এসে যাবে। হা হা হা।

শামু সিং শূন্যে কুঠার তুলে ভয়ানকভাবে হাসল। তার হাসির শব্দ চারদিকে গুঞ্জরিত হল। মুন্না কেঁপে উঠল। মুন্নার মা সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে শাম সিংএর পায়ের উপর পড়ে কেঁদে কেঁদে বলল, আমাকে মেরে ফেল, কিন্তু আমার খোকনকে জীবিত ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ি।

শামু সিং মুন্নার মাকে লাথি মেরে দূরে ফেলে দিল। তিনি মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। শামু সিং গর্জন করে বলল, আজ তোমরা দু'জন নয়, তিনজনের কেউই আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে না। একটা একটা করে সবাইকে আমি শেষ করে দেব। তবে হাঁ, যেহেতু তুমি আমার স্ত্রীর বোন এজন্য তোমার সন্তানকে তোমার সামনে মারব না। প্রথমে তোমাকে, তারপর তোমার সন্তানকে, তারপর এই মেয়েকে খুন করব।

এই বলে শামু সিং মুন্নার মায়ের কাছে গিয়ে আবার শূন্যে কুঠার উঠাল। হঠাৎ কনুলা চিৎকার করে বলল, থাম শামুর সিং! শামুর সিং পাশ ফিরে দেখল যে তার দিকে পিস্তল তাক করে কনুলা দাঁড়িয়ে আছে। কনুলা ও তার পিতাকে অপহরণের পর কনুলার বাবা এ পিস্তলটি সব সময় শিয়রের কাছে রাখতেন। বুদ্ধি করে পিস্তলটি কনুলা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। পিস্তল তাক করলেও কনুলার ভয়ও হচ্ছিল, তবু সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, কুঠার ফেলে দাও, না হলে এক্ষুণি গুলী করব।

শামু সিং অট্টহাসি হেসে একপা সামনে এগিয়ে বলল, এত ছোট মেয়ে তুমি, অথচ তুমি আমায় গুলী করবে?

কনুলা দৃঢ়স্বরে বলল, আর এক পা সামনে এগুলে ভাল হবে না বলছি, আমি ঠিকই তোমাকে গুলী করব।

শামু সিং অগত্যা সেখানেই দাঁড়িয়ে রাগে ফুলতে লাগল। কনুলা বলল, তুমি তাড়াতাড়ি তোমার মাকে নিয়ে দরজার বাইরে চলে যাও। আমি এই দুষ্টকে ঠেকিয়ে রাখছি, যদি সে এক পা এগোবার চেষ্টা করে আমি ঠিকই তাকে গুলী করব। কিছুতেই ছাড়ব না।

মুন্না তখন তার মাকে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। শামু সিং রাগে কাঁপছিল কিন্তু কিছুই বলতে পারছিল না। সে সময়ে এ

ছোট্ট মেয়ের মনে এতো সাহস যে কোথা থেকে এল কে জানে। শক্ত দেয়ালের মতো সে শামু সিং-এর গতিরোধ করে দাঁড়ল। ততক্ষণে মুন্না ও তার মা দরজার বাইরে চলে গেছে। কনুলাও কিছু মাত্র দেরী না করে বাইরে চলে গেল। তাকে যেতে দেখে শামু সিং দরজার দিকে অগ্রসর হল কিন্তু কনুলা চিৎকার করে বলল, চাবি ঘুরিয়ে দাও। মুন্না চাবি ঘুরিয়ে দিল। শাম সিং কুঠার উঠিয়ে দরজার দিকে ছুটে যাচ্ছিল কিন্তু দরজা বন্ধ হওয়ায় ভেতরে আটকা পড়ে গেল।

মুন্নার মা, মুন্না ও কনুলা তাড়াতাড়ি সিঁড়ি অতিক্রম করতে লাগল। শামু সিং বন্ধ দরজায় করাঘাত করছিল। কিন্তু কুঠার কাঠ কাটতে পারে মাংস কাটতে পারে পাথর তো আর কাটতে পারে না।

সিঁড়ি অতিক্রম করে ওরা শকুন্তলার ছবি শোভিত দেয়ালের কাছে গেল। সে পাশেও ভোমরের ছবি ছিল। ভোমরকে ধরার পর সে দরজাও খুলে গেল। তারা তিনজনই শিবালয়ের বড় হল ঘরে এসে পৌঁছুলো। ততক্ষণে সেখানে বহু লোক জড় হয়েছে। উপস্থিত লোকদের মধ্যে কনুলার বাবা ও তার ড্রাইভারও রয়েছে। পুলিশের গাড়ীতে করে বহু সংখ্যক পুলিশ হাজির হয়েছে। তারা মন্দিরের পুরোহিত গঙ্গারাম ও যমুনা রামকে ধরে রেখেছে।

কনুলার বাবা শহর থেকে পুলিশের দুটি জীপ নিয়ে এসেছিলেন, সে জীপে করে সবাই তাড়াতাড়ি শহরে ফিরে গেল। ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছে। এক ঘন্টা পর ঠাকুর সিং-এর ফাঁসি হবে। শহরে পৌঁছে ওরা জজ সাহেবের বাড়ীতে গেল। মুন্নার মাকে জীবিত দেখে জজ ঠাকুর সিংএর ফাঁসির আদেশ নাকচ করে দিলেন। তারপর সবাই জেলখানায় ছুটে গেল।

ঠাকুর সিং ফাঁসি মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে, জল্লাদ তার গলায় রেশমের ফাঁস পরিয়ে দিয়েছে, মুখে পর্দাও লাগানো হয়েছে। জীবনের শেষ সময়ে ঠাকুর সিং ভগবানকে স্মরণ করছে। জেল সুপার হাত তুলে রুমাল নেড়ে বললেন, এক, দুই—

হঠাৎ মুন্না চিৎকার করে উঠল। তার হাতে জজ সাহেবের হুকুমনামা। সেটা পড়ে জেল সুপার ফাঁসি স্থগিত রাখার জন্য জল্লাদকে ইঙ্গিত করলেন।

ফাঁসি মঞ্চ থেকে নামানোর পর তাঁর মুখের পর্দা সরালে ঠাকুর সিং দেখলেন মুন্নার মা তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। তাঁদের প্রিয় কুকুর ডুব্বু আনন্দে চিৎকার করছে।

নিরপরাধ পিতাকে তার সাহসী ছেলে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তারপর সবাই কোলাকুলি গলাগলি করল। জেলসুপারসহ উপস্থিত সবার চোখে আনন্দাশ্রু চিকচিক করতে লাগল! একটা ছোট্ট বালকের সাহসিকতায় আজ একজন নিরপরাধ মানুষের জীবন রক্ষা পেয়েছে।

শামু সিং ও তার স্ত্রীকে কারারুদ্ধ করা হল। ডাকাতদের গোপনে সহযোগিতা এবং মন্দিরের ভেতর থেকে চোরাই মাল উদ্ধারের অভিযোগ দেখিয়ে গঙ্গারামকেও গ্রেফতার করা হল। পাহাড়ী ডাকাতরা দলবলসহ ধরা পড়ল। সমগ্র এলাকায় পূর্ণ শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা ফিরে এল।

স্ত্রী ও ছেলে মেয়েকে নিয়ে ঠাকুর সিং আবার মধুপুরে কৃষিকাজ শুরু করলেন। মুন্নার ইচ্ছাক্রমে শেঠজী মধুপুরে একটা বড় স্কুল স্থাপন করলেন। মুন্না ও কনুলা সেখানে পাশাপাশি পড়াশোনার মাধ্যমে শৈশবের নিষ্পাপ দিন কাটাতে লাগল।